বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

গেরিলা রণনীতি

শাইখ আবু মুসআব আস-সুরী ফা. আ.

(এই দারস টি আমরা কে ডি আই এর অনলাইন দারসে ৩ টি পর্বে আলোচনা করেছি (৯,১৩,১৫) চলমান দাওরার সুবিদার্থে পুরো আলোচনা এক সাথে দেওয়া হল।)

সূচি

প্রথম আলোচনা

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد-

আমরা আজ আলোচনা করবো গেরিলা যুদ্ধের চিন্তাধারা নিয়ে, গেরিলা যুদ্ধের মূলনীতি ও ভিত্তি বিষয়ে।

মুজাহিদ ভাইদের মাঝে আমি লক্ষ্য করেছি গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে তাদের ধারণা হচ্ছে, গেরিলা ওয়ারফেয়ার হচ্ছে এমন একটি লড়াইয়ের নাম, যে লড়াইয়ে অস্ত্রবহনকারী গ্রুপ অকস্মাৎ শত্রুর উপর হামলা করে লুকিয়ে পড়ে। আক্রমণ ও পলায়নের এ যুদ্ধ কৌশলটির নাম গেরিলা ওয়ারফেয়ার বা গেরিলা যুদ্ধ। এ

লড়াই নিয়মতান্ত্রিকতাহীন একটি লড়াই। মোটকথা এখানে কোনো প্রকার মুখোমুখি লড়াই হয় না। ব্যস এতটুকুতেই এ বিষয়ের আলোচনা সমাপ্ত।

এরপর মুহাজিদ ভাইদের মাঝে এ বিষয়ক জ্ঞানের ব্যাপারে তারতম্য থাকে। বিশেষ করে কিছু ভাইয়ের মস্তিষ্কে এ বিষয়ে স্পষ্ট চিত্র থাকে, যারা বিভিন্ন তানজিমে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কিংবা তারা পূর্বে বিভিন্ন গোপন কার্যক্রমে কাজ করেছিলেন বা কোনো সেনা স্কোয়াডে ছিলেন। এরা কোনো আন্দোলনময় কাজের মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছন অথবা গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে কিছু বইপত্র পড়েছিলেন। তাই এদের কাছে গেরিলা যুদ্ধের বিষয়ে ধারণা আছে।

আমি প্রথমেই বলে নিই, গেরিলা যুদ্ধ বিষয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। এটি এমন একটি শাস্ত্র যে ব্যাপারে জিহাদ বিষয়ে প্রত্যেক চর্চাকারীর জানা-শুনা থাকা ওয়াজিব। যারা গেরিলা যুদ্ধ চর্চা করেন, তাদের জন্য এ বিষয়ে জ্ঞান থাকা ওয়াজিব। স্পষ্ট করে বললে, আমরা যেহেতু ব্যবসা করি না, তাই আমাদের জন্য যাকাত ও আর্থিক লেনদেন বিষয়ে পা-িত্য অর্জন করা ওয়াজিব নয়। অন্যদিকে আমরা যেহেতু যুদ্ধ করি, যুদ্ধের আমল করি,

জিহাদের আমল করি এবং এতদবিষয়ে বিভিন্ন কাজে রত আছি, তাই আমাদের জন্য ওয়াজিব হচ্ছে এ বিষয়ে শরয়ী হুকুম-আহকাম ও প্রয়োগ-পদ্ধতি সম্প র্কে জানা|

এ বিষয়ে আমার نظرية حرب العصابات بشكل عام নামে একটি গবেষণা আছে| পেশাওয়ার গেলে সেটার কিছু কপি করে প্রশিড়্গণ শিবিরে পাঠিয়ে দেবো|...এটি হচ্ছে এক মিসরী ভাইয়ের খাতার একটা অংশ| আমি এ অংশটা তার কাছ থেকে নিয়েছিলাম| কারণ আলোচনাটা বেশ ভাল হয়েছে|...ওটা ২০টা বইয়ের সারসংড়্গেপ| তিনি এটাতে এ বইগুলোর কমন পয়েন্টগুলো তুলে এনেছেন|

সাধারণত যে সব পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়

কখন গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়? এর উত্তর হচ্ছে ৩টি অবস্থায় গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়:

এক. বহিঃস্থ শক্তির প্রত্যড়্গ দখলদারিত্ব

এ অবস্থাটি স্প ষ্ট| একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল| কিন্তু বাহিরের কোনো শক্তি এসে সে দেশটা দখল করলো, সে রাষ্ট্রের

সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিল এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিল। মোটকথা বাহিরের কোনো শক্তি এসে একটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে নিঃশেষ করে দিল।

এমন দখলকৃত রাষ্ট্রের কোনো কাঠামোগত শক্তি থাকে না যে, দখলকারী সেনার বিরুদ্ধে তারা প্রতিরোধ করবে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে। বরং একটা সেনার কিছু অংশ, পুলিশ বাহিনীর কিছু অংশ, নিরাপত্তা বাহিনীর কিছু অংশ বাকী থাকে। দখলকৃত দেশের যে সব মানুষের মাঝে (আমি এখানে সাধারণ একটা অবস্থার কথা বলছি, যে অবস্থায় মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই আছে) উদ্দীপনা-উত্তেজনা থাকে, তারা এ নতুন পরিস্থিতিকে মানতে অস্বীকার করে এবং তাদের মাধ্যমে সংঘটিত হয় বিভিন্ন নতুন যুদ্ধ। আর এরাই তখন চর্চা করে গেরিলা যুদ্ধ।

যুদ্ধরত দুটি পক্ষের শক্তিতে বড় ও সবল পক্ষকে প্রতিহত করতে দুর্বল পক্ষটিই সবসময় গেরিলা রণনীতির শরণাপন্ন হয়। এক্ষেত্রে কোনো স্পষ্ট সংঘর্ষে জড়িত হয় না তারা। তারা আক্রমণ ও পলায়ন নীতি গ্রহণ করে। আত্মগোপন করে পাহাড়ে। আত্মগোপন করে শহরের ভেতরে। ছোট ছোট গেরিলা

দল গঠন করে তারা| এরপর এ পরিস্থিতিতে প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমে পড়ে দখলদার শক্তির বিরম্নদ্ধে|

গেরিলা যুদ্ধকারী পড়্গের একটি গুরম্নত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং বিপড়্গের সাথে তাদের বড় পার্থক্যটি হচ্ছে সংখ্যা ও সরঞ্জামের স্বল্পতা| নবগঠিত রাষ্ট্রপড়্গের থাকে বিশাল সংখ্যা অন্যদিকে প্রতিরোধকারীদের সংখ্যা হয় স্বল্প|

যেমন, আল-জেরিয়ায় ফ্রান্সের দখলদারিত্ব| একইভাবে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর (যখন পশ্চিমা বিশ্ব দুনিয়াকে বিশেষ করে ইসলামী বিশ্বকে ভাগ করে নিয়েছিল নিজেদের মাঝে)| ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর সংঘটিত প্রতিটি দখলদারিত্বই এ প্রকারের উদাহরণ| এমন দখলদারিত্বের পর বিভিন্ন জিহাদী আন্দোলন, দেশীয় আন্দোলন ও গেরিলা আন্দোলন দাঁড়িয়ে যায় এবং দখলদার শক্তিকে প্রতিহত করে|

এ অবস্থাটি যেখানে সংঘটিত হয়, সেখানে জিহাদ বা কিতালের আমলকারী দলগুলোকে তাদের সাধারণ মানুষদের জিহাদের ব্যাপারে পরিতুষ্ট করতে কষ্ট করতে হয় না| কারণ সমস্যা তাদের সামনে স্প ষ্টই থাকে| স্প ষ্ট থাকে যে, দখলদাররা হচ্ছে

বিদেশী আর এরা হচ্ছে দেশীয় মানুষ। স্পষ্ট থাকে যে, ওরা হচ্ছে কাফের আর এরা হচ্ছে মুসলিম।

এরকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবে অপারেশন শুরু হয়ে যায়। সাধারণ মানুষকে লড়াইমুখী করার জন্য গেরিলা দলকে বিরাট আকারে দাওয়াতের আমল করতে হয় না। সাধারণ মানুষকে তৃপ্ত ও সম্মত করতে মিডিয়া ও ব্যাখ্যাগত কাজে বেশি কষ্ট করতে হয় না।

এমন পরিস্থিতি যেখানে থাকে, সেখানে কেউ গেরিলা দলগুলোতে যোগ না দিলেও এ ব্যাপারে পরিতুষ্ট থাকে যে, গেরিলাদলগুলোই সত্য ও সঠিকতার উপরে আছে এবং তারা শরয়ী দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। (দেশের জন্য লড়াই হলে) দেশের জন্য লড়ে যাচ্ছে।

এ পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা লম্বা করছি না। কপিটি আসলে আপনারা তা পড়ে নেবেন।

দুই. চলমান সরকারের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরোক্ষ দখলদারিত্ব

এক্ষেত্রে সে দেশের সরকারের বৈধতাকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মানুষের কাছে সরকারের যে বৈধতা রয়েছে তার আড়ালে দখলদারিত্ব চালিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। যেমনটা এখন (১৯৮৯) আফগানিস্থানে চলছে। যখন এখানে রুশরা আসে, তারা এসে আফগান দখল করে নিলেও চলমান সরকার ব্যবস্থাকে একেবারেই ধ্বংস করে দেয়নি। বলেনি যে, আমরা আফগান শাসন করবো। তারা কিন্তু এসেছিল আফগান কম্যুনিস্ট সরকারের আবরণতলে।

যখন আমেরিকা দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রবেশ করে, তখন তারা দক্ষিণ কোরিয়ায় সরকার কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়নি। একইভাবে ল্যাটিন দখলের সময়ও তারা এ পদ্ধতি ব্যবাহর করে।

এ ধরণটি অনেকবারই সংঘটিত হয়েছে। আর এ ধরণটির অধিক স্পষ্ট উদাহরণ জাযিরাতুল আরব। দখলদার আমেরিকান ও পশ্চিমা সেনাদের ইচ্ছা এটা নয় যে, 'আমরা সব কিছু ধ্বংস করে দেবো এবং এ দেশ শাসন করবো।' বরং তারা এসে চলমান সরকারকে দুর্বল ও ভগ্নপ্রায় করে রেখেছে এবং নিজেরা এ সরকারকে অস্ত্র, পরামর্শ, ইন্টেলিজেন্স সহ

বিবিধভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে৷ কিন্তু এখানে আসল ড়্গমতা সাম্রাজ্যবাদীর হাতে৷ আর সবার সামনে চলমান সরকার শাসন করার ভান করে যাচ্ছে৷ যে সরকারকে দেশের ‘বৈধ সরকার’ নাম দেয়া হয়৷

নাজিবুলস্নাহ[1] নিজকে একদল শাইখ ও আলেমের মাঝে বেষ্টিত রাখে৷ যেমনটা প্রতিটি মুসলিম দেশের সরকাররা থাকে৷ এরপর সে মানুষকে বলে যে, ‘সে-ই হচ্ছে বৈধ শাসক৷ আর যারা তার বিরম্নদ্ধে লড়াই করে তারা হচ্ছে অপরাধী৷ এরা দেশে বিশৃঙ্খলা করতে চায়৷ এরা গৃহযুদ্ধ ছড়াতে চায় দেশে৷’

আলোচ্য পরিস্থিতিটি গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হবার দ্বিতীয় পরিস্থিতি৷ এ পরিস্থিতি আপতিত হলে অবধারিতভাবেই একটা দেশের মানুষ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়৷ এক ভাগ এ পরিস্থিতি মেনে নেয় না, মাথানত না করে তারা প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরম্ন করে, শুরম্ন করে গেরিলা যুদ্ধ৷ কিন্তু আরেক ভাগ মানুষের নিকট পরিস্থিতি সন্দেহজনক ঠেকে, তারা এত দ্রম্নত গেরিলা যুদ্ধে পরিতুষ্ট হতে পারে না৷ কারণ তারা বিদেশী শত্রম্নকে সরাসরি

---

[1] gynv¤§v` bvwReyjøvn wQj AvdMvb Kgy¨wb÷ †bZv| 1986 †_‡K 1992 ch©šÍ AvdMvwb¯Ívb kvmb K‡i †m| 27 †m‡Þ¤^i 1996 †Z Zvwjevb hLb ivRavbx Kvey‡j cÖ‡ek K‡i, ZLb bvwReyjøvn Zvwjev‡bi nv‡Z wbnZ nq|

আক্রমণভাগে দেখতে পায় না। আর এটাই ঘটেছিল আফগানিস্থানে।

যখন সরকারপ্রধান কুফরি করল। হিজাব ছিঁড়ে ফেলল। দেশের মধ্যে সেক্যুলারিজম ছড়িয়ে দিতে লাগল। তখন কিছু মানুষ আফগানিস্থানে জিহাদ করতে দাঁড়িয়ে গেল শুরুতেই। কিন্তু কিছু মওলবি, আত্মীয়-স্বজন এতটুকু পরিতুষ্ট হতে পারেনি এ জিহাদে যে, তারাও এসে জিহাদে যোগ দেবে। বরং তারা বলতে লাগল, 'সরকারপ্রধান তো নামাজ পড়ে, রোজা রাখে। সে এ দেশের বৈধ সরকারও।' এরপর একসময় কম্যুনিস্ট বিপ্লব হল। সরকারপ্রধান অপসারিত হল। ক্ষমতা পেল দাউদ, তারপর তারাক ও কারমাল। এরা ছিল আফগান মানুষ। এ পরিস্থিতিতে সরাসরি রুশদের দখলদারত্ব দেখা যায়নি। যদিও এসব সরকার ছিল কম্যুনিস্ট। আর কমিউনিজম কুফর। তবুও আফগানিস্থানের মানুষগুলো কিতাল শুরু করার জন্য পরিতুষ্ট হয়নি। কেবল কিছু যুবকই তখন জিহাদের ঝাণ্ডা উঁচিয়ে ধরে। অন্যরা নির্লিপ্ত থাকে। এরপর যখন কম্যুনিস্টদের জন্য পরিস্থিতি সংকীর্ণ হতে থাকে, তখন তারা সাহায্যের আবেদন জানায় রুশদের কাছে। এবার রুশ সরাসরি প্রবেশ করে আফগানিস্থানে। ফলে আফগানিস্থানের মানুষরা তখন বলতে

থাকে, ‘এখন নিরেট দখলদারিত্ব দেখা যাচ্ছে রুশদের। আর রুশরা বিদেশী।’ এরপরই বড় আকারে জিহাদে যোগ দেয় মানুষরা।

লক্ষ্য করুন, যখন রুশরা আফগান ছেড়ে যায়, তখন অনেক মানুষের মন থেকে কিতালের যৌক্তিকতা উঠে যেতে থাকে। এমনকি রব্বানী মানুষদের এ পর্যন্ত বলে যে, ‘কম্যুনিজম মারা গেছে। রুশরা বেরিয়ে গেছে। এখন আমাদের করণীয় হচ্ছে, এ সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ খোঁজা। কারণ আমরা আফগানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবো।’ তখন মানুষের মনে জিহাদ-কিতাল নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়।

আলোচ্য পরিস্থিতিটি গেরিলা যুদ্ধের দ্বিতীয় পরিস্থিতি। এ পরিস্থিতিতে কার্যকর শাসকের ছদ্মাবরণে দখলদারিত্ব চলতে থাকে। দখলদার সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চলমান সরকারকে বলবৎ রেখে মানুষের চোখের সামনে একটি পর্দা ফেলে রাখে।

এ পরিস্থিতিটি আমাদের জন্য খুবই উদ্বিগ্নতার হয়ে উঠেছে। কারণ এ পরিস্থিতিটিই বর্তমানে জাযিরাতুল আরবে শুরু হয়েছে। জাযিরাতুল আরবের প্রতিটি রাষ্ট্রেরই ক্ষমতার কলকাঠি কার্যত আমেরিকার হাতে। আমেরিকা জাযিরাতুল

আরব শাসন করে আসছে| যেভাবে সোভিয়েতরা আফগানে সরাসরি প্রবেশ করার আগে পর্দার আড়াল থেকে আফগান সরকারকে সমর্থন ও পরিচালনা করেছে|

কিন্তু এখন সর্বশেষ অবস্থা হচ্ছে, জাযিরাতুল আরবে আমেরিকান সৈন্য প্রবেশ করেছে| আর জাযিরাতুল আরবের ভাইরা জানতে পেরেছে যে, এ সব মানুষ তাদের পূর্ণ সংস্কৃতি নিয়েই এসেছে| জাযিরাতুল আরবে এখন ৫৬টি গির্জা তৈরি করা হয়েছে আমেরিকান সেনার মধ্যকার খ্রিস্টানদের পুঁজা-অর্চনা করার জন্য| আর ১৩টি ইহুদি গির্জা তৈরি করা হয়েছে ইহুদীদের জন্য| খাইবার যুদ্ধের পর জাযিরাতুল আরব থেকে ইহুদিদের নিশানা মুছে যায়| সে খাইবারের পর থেকে এ সময়ে এসে জাযিরাতুল আরবে প্রথমবারের মতো ইহুদী শিঙা বাজালো এ ইহুদীরা| এমনটাই লেখা হয়েছে একটি ইহুদী ইংরেজী পত্রিকায়| তারা বলে যে, প্রথমবারের মতো ইহুদীদের শিঙায় ফুঁ দিয়েছে তারা খাইবার পতনের পর| ইহুদিরা হিব্রুয় বছরের শুরুতে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার জন্য শিঙা ও খেজুর গাছ প্রেরণ করেছে জাযিরাতুল আরবে| খাইবার পতনের পর এ প্রথম জাযিরাতুল আরবে এগুলো হচ্ছে| আমেরিকান সেনাদের মধ্যে প্রায় ২হাজার ইহুদী বিদ্যমান|

তাদের সাথে আছে ৩০ হাজার নারী সৈন্য। ৩০হাজার নারী সৈন্যের অধিকাংশই পতিতা-চরিত্রহীনা। আমি শুনেছি আমেরিকা পতিতা বাছাই করে। এরপর তাদের দ্রম্নত সামরিক প্রশিড়্গণ দেয়। কারণ আমেরিকান সেনার প্রত্যেক নারীই পুরম্নষ সেনাদের ভোগের পাত্রী হতে চায় না। এসব নারী সাধারণ সৈন্যর মতো, তারা পতিতা হতে অস্বীকার করে। তারা দেশ ও মতাদর্শের জন্য লড়াই করে এতটুকুই। তারা ভদ্র নারী সেনা। তাদের পরিবার আছে। তাদের মধ্যে একটা পরিমাণ পর্যমত্ম সভ্যতাবোধ আছে। তাই সাধারণ নারী সেনাদের একটা অংশ পতিতাবৃত্তি করতে সম্মত হয় না। অগত্যা আমেরিকা পতিতাদের সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে। তাদের সামরিক প্রশিড়্গণ দেয়। এভাবে তারা পতিতাবৃত্তি করার জন্য সেনাতে থাকে। যাই হোক আলোচনায় ফেরা যাক।

বলছিলাম, আমেরিকা সেনাবাহিনী নিয়ে, নিজেদের সংস্কৃতি নিয়ে এসেছে। রিয়াদের কিছু ভাই বলেন, আমেরিকানদের জন্য বর্তমানে বিশেষ হোটেল তৈরি হয়েছে। সেখানে কেবল আমেরিকানদেরই প্রবেশাধিকার রয়েছে। হোটেলে মদ থাকে বিভিন্ন জাতের।

যেহেতু এ দেশে জীবিত একটি জাতি রয়েছে, তাই এ পরিস্থিতিটিই গেরিলা যুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত হবার যৌক্তিকতা বহন করে| যেমনটা অন্য দেশে হয়েছে|

অবশ্য আমি সৌদি আরব সম্পর্কে বলি, এখানে পরিস্থিতি ঘোলাটে| কিন্তু কুয়েতের পরিস্থিতি অধিক স্পষ্ট তুলনামূলকভাবে| কুয়েতে সংঘটিত আপতিত পরিস্থিতির ব্যাপারে অনেক শুনেছি আমি| বাহরাইনের পরিস্থিতি সবচে নিকৃষ্ট| বাহরাইন আমেরিকান সৈন্যদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশ যাপন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে| আর ওমান যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরির আগেই ঘৃণ্য পরিস্থিতিতে আছে| অর্থাৎ জাযিরাতুল আরবে প্রত্যড়্গা দখলদারিত্বের বশীভূত হয়নি এমন কোনো অঞ্চল নেই এখন| তবে ইয়ামান অঞ্চল বাদে| ইয়ামান প্রত্যড়্গা দখলাদারিত্ব নয়| বরং সেখানে পরোড়্গা দখলদারিত্বের রূপ বিদ্যমান আছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বশীভূত হয়ে|

দ্বিতীয় পরিস্থিতির আলোচনায় এসব উদাহরণ বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছে| যখন এ পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে, তখন প্রতিরোধের আমল শুরম্ন হয়ে যায়| আমি শুনেছি যে, সাউদি আরবে এমন ঘটনা ঘটেছে| কিছু লোক একটা আমেরিকানের উপর গুলি

চালায়| একজন আহত হয়| দুবাইতে কিছু মানুষ এক ইতালি সৈন্যকে হত্যা করে| লোকটা সাগর উপকূলে হাঁটছিল সে সময় তাকে হত্যা করা হয়| হত্যা তো হলো, কিন্তু হত্যাকরীকে সনাক্ত করতে পারেনি তারা|

মোটকথা যখন এ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন গেরিলা যুদ্ধ সূচনাকাল শুরম্ন হয়ে যায়|

গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন হবার প্রথম পরিস্থিতিটি হচ্ছে প্রত্যড়্গা দখলদারিত্ব| যেখানে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে শেষ করে দখলদারদের নতুন রাষ্ট্রকাঠামো বিরাজমান হয়|

দ্বিতীয় পরিস্থিতি হচ্ছে, পরোড়্গা দখলদারিত্ব| যেখানে পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে আড়াল বানিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি রাষ্ট্র পরিচালনা করে| যেমনটা আফগানিস্ত্মানে আগে ঘটেছে, একইভাবে ঘটেছে দড়্গিণ কোরিয়া ও ঘটছে জাযিরাতুল আরবে|

তিন. স্থানীয় স্বৈরাচারী সরকার

ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ স্থানেই বর্তমানে এ অবস্থা চলছে| একই অবস্থা বিরাজমান আছে তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশে|

যেমন সিরিয়া| সিরিয়ায় ভিনদেশীদের হামলা ছিল না| ভিনদেশীদের হামলা হবে বলেও এমন কোনো চিন্তা ছিল না মানুষের মনে| কিন্তু এখানে ছিল স্থানীয় কাফের সরকার| জুলুমবাজ সরকার| এ সরকার আর্থিক ও আত্মিক ক্ষতি করেছে| অন্য দেশগুলোর মতো এখানে খাবার ছিল না| মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে রুটি কিনছে খাবার জন্য| তেমনি অবস্থা হয়েছে পেট্রল পাম্প ইত্যাদি জায়গায়|

একই অবস্থা বিরাজ করছে লিবিয়া, আলজেরিয়া সহ পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশে|

জুলুমের পরিস্থিতি যখন মানুষের সহ্য সীমানার বাইরে চলে যায় তখন মানুষের মধ্যকার কিছু অংশ সহিংস কাজ শুরু করে| যখন এ কাজটা মুসলিমদের হাতে হয়, তখন তাকে আমরা জিহাদ বলি| যখন তা অমুসলিমদের হাতে হয়, তারা তাকে নাম দেয় দেশপ্রেমীদের আন্দোলন|

কখনো কখনো গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয় সম্পদ বণ্টনের পার্থক্যকে ঘিরে| যখন দেশের একটা অংশের কাছে সম্পদ গচ্ছিত থাকে আর বিশাল একটা অংশ দারিদ্রতার মাঝে থাকে, যখন দেশের রাজা বা প্রধানমন্ত্রীর আশপাশের লোকেরা একচেটিয়া সম্পদ

হস্তগত করে রাখে। তখন নিঃস্বতা ও দারিদ্রতায় জীর্ণ মানুষজন গেরিলা যুদ্ধের আশ্রয় নেয়।

যে পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, সেগুলোর মধ্যে আলোচিত এ পরিস্থিতিগুলোই অধিক গুরুত্ববহ এবং অধিক প্রসিদ্ধ।

মোটকথা, গেরিলা যুদ্ধের কারণ হচ্ছে, বহিশক্তির প্রত্যক্ষ দখলদারিত্ব অথবা চলমান সরকারের আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পরোক্ষ দখলদারিত্ব কিংবা স্থানীয় সরকারের স্বৈরাচারিতা। মোটাদাগে এ তিনটি পরিস্থিতি একটি দেশে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হওয়ার কারণ।

গেরিলা বাহিনী বা মুজাহিদ বাহিনীর বিরম্নদ্ধে যে সব কৌশল-ট্যাকটিক গ্রহণ করা হয়

যদি আলস্নাহ আপনাদের তাওফীক দান করেন আর আপনারা যে জন যে অঞ্চল থেকে এসেছেন, সে অঞ্চলে যদি গেরিলা যুদ্ধ চর্চা শুরম্ন করেন, তখন ড়্গমতাবান বিপড়্গ গেরিলা যুদ্ধ ঠেকাতে কী কী পদড়্গেপ নেবে তা-ই এবারের আলোচনা|

এটা স্বাভাবিক যে, আপনাদের সামনে জালালাবাদে বর্তমানে যে পরিস্থিতি বিদ্যমান আছে, এ পরিস্থিতি আপনারা নিজদের অঞ্চলে পাবেন না| এখন আফগানে ওদিক থেকে শক্তিমান বিপড়্গ গুলি ছুঁড়ছে, বোমা মারছে আর আমরা এদিক থেকে তাদের উপর গুলি ছুঁড়ছি| এ পরিস্থিতিটি যুদ্ধের সর্বশেষ স্ত্মর| এখন এখানে গেরিলা যোদ্ধারা ও রাষ্ট্রপড়্গ সমঅবস্থায় আছে|

প্রতিটি অঞ্চল যুদ্ধের স্ত্মরগুলো পার হয়ে সর্বশেষ স্ত্মরে উপনীত হবে| তো যুদ্ধের এ স্ত্মরগুলোতে রাষ্ট্রপড়্গ গেরিলা যোদ্ধাদের অবস্থা উপযোগী পদড়্গেপ গ্রহণ করবে ঠেকানোর জন্য|

এখন আমি সে সব পদড়্গেপের কেবল শিরোনাম বলে যাবো| যদি কোনো জায়গায় বিস্ত্মারিত বলার প্রয়োজন হয় তবে

সেরকম ব্যাখ্যা করবো| গেরিলা বাহিনী/মুজাহিদ বাহিনীর বিরম্নদ্ধে ড়্গামতাবান শক্তি যে সব কৌশল ও ট্যাকটিক গ্রহণ করে তা হলো,

১. সুসংহত শক্তিশালী সামরিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা

দেশের বড় বড় শহরগুলোতে রাষ্ট্রপড়্গ **সুসংহত শক্তিশালী সামরিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠা** করবে| প্রতিটি শহরেই তারা বড় দুর্গ গড়ে তুলবে| এমনও শহর আছে যেখানে গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন হওয়ার আগে কোনো সামরিক স্থাপনার অস্তিত্বত্বও ছিল না, শহরটা অবহেলিত ছিল| কিন্তু গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন হওয়ার পর পর সেখানে সামরিক স্থাপনা অস্তিত্বে আসবে, সুসংসহত সামরিক দুর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে| যখন কোনো জায়গায় সামরিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তখন এ সামরিক প্রতিরোধ শক্তি অনুপ্রবেশ করে সেখানে| অথবা বিভিন্ন সেক্টর ও এলাকায় গোপনে ওঁৎ পেতে থাকে| এভাবে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া ও আক্রমণ করার জন্য এক বড় সামরিক শক্তি প্রস্তুত থাকে|

২. প্রধান প্রধান সড়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ টহল

শৃঙ্খলাবদ্ধ টহল শুরম্ন হয় প্রধান প্রধান সড়কে| গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন হলে আপনি দেখবেন, এতদিন যে রাস্ত্মাটা শান্ত্ম ছিল,

যে রাস্তাটায় সামরিক কোনো নড়নচড়ন ছিল না সেখানে টহল শুরু হয়ে গেছে। কখনও কখনও এসব টহল হয়ে থাকে বেসামরিক লেবাসে। আবার কখনও হয়ে থাকে সামরিক সাজে। বিশেষ করে যখন পরিস্থিতির উত্তাপ বাড়তে তখন টহলও জোরদার হতে থাকে।

সিরিয়া জিহাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, ঘটনার শুরুর দিকে বেসামরিক পোশাকে পায়ে হেঁটে টহল চলছে। তখন এসব টহলদাতার উপর মার পড়লে তারা সে মার সহ্য করতে পারল না তারা। তাদের ও মুজাহিদদের মাঝে শক্তির পার্থক্য বুঝা যায় এ থেকে। এরপর সরকার যৌথ টহল নামায়। টহলদার লোকেরা অর্ধেক গাড়িতে আধা সামরিক অবস্থায় টহল দিতে শুরু করে আর বাকি অর্ধেক বেসামরিক লেবাসে। কিন্তু যখন পরিস্থিতি আরো ভয়ানক হল সরকার রাস্তায় সাঁজোয়া গাড়ি নামালো। সাঁজোয়া গাড়ির সাথে ১০জন পদাতিক থাকতো। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তলস্নাশী চালাতো। সরকারী এ টহলগুলো শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে থাকে। তারা নির্দিষ্ট সময়ে টহল দিতে আসে। দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত টহল চলে।

৩. আকস্মিক অপ্রত্যাশিত টহল-তলস্নাশী চালানো

আকস্মিক অপ্রত্যাশিত টহল চালাবে সরকার| একে তারা নাম দেয় Rapid Patrols। অবস্থা এমন হবে যে, কোথাও কোনো টহলের নাম-গন্ধ নেই| কিন্তু হঠাৎ করে অকস্মাৎ ২০টা টহলবাহিনী এসে একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল ঘেরাও করে নিচ্ছে এবং হঠাৎ করে সবখানে তলস্নাশী শুরম্ন করে দিয়েছে| তখন দেখা গেল আপনি কোনো বিশেষ কাজে আছেন, আপনার সাথে অস্ত্র আছে অথবা প্যাকেজ বা অন্যকিছু আছে| তো এভাবে হঠাৎ করে টহল চলবে আর আপনি মুহূর্তের মধ্যে তাদের হাতে পড়ে যাবেন| সিরিয়ায় যখন এ কৌশলটি সরকার ব্যবহার করে, তখন মুজাহিদদের অনেক বড় ড়্গতির সম্মুখীন হতে হয়| সেনাবাহিনী জানতে পেয়ে যায় যে, শহর বিরাট সংখ্যক পলাতকের অস্ত্মিত্মত্ব রয়েছে|

শৃঙ্খলাবদ্ধ টহলের ড়্গেত্রে আপনি জানতে পারবেন যে, কখন কোন সময়ে টহল হবে| উদাহরণত ৬টা বাজে টহল শুরম্ন হয়ে ৯টার দিকে শেষ হয়ে যাবে| টহলের সময় আপনি অবসর থাকলেন| আর টহল শেষে ৯টার দিকে আপনি বের হলেন| কিন্তু আকস্মিক টহলের ড়্গেত্রে তো অবস্থা বেগতিক হয়ে যায়| কাফের বাহিনী যখন দেখল আকস্মিক টহলের পরিস্থিতিতে

গেরিলা বাহিনী ভেদযোগ্য (ঁষহধৎধনষব) হয়ে যায়, তখন তারা দেশের প্রধান প্রধান অংশগুলোতে আকস্মিক টহল ও তলস্নাশী শুরম্ন করে| এ তৃতীয় কৌশলটি গেরিলা বাহিনীর বিরম্নদ্ধে শক্তিমান বাহিনী প্রয়োগ করে| সাধারণত সামরিক চর্চার উত্তরণের সাথে সাথে এ কৌশলটি প্রয়োগ হতে থাকে|

৪. ভয়ানক গোয়েন্দা ও খবরীর জাল বিস্ত্মারকরণ

শক্তিমান পড়্গ গেরিলা বাহিনীর বিরম্নদ্ধে **ভয়ানক গোয়েন্দা ও খবরীর জাল** বিস্ত্মার করে রাখে| রাষ্ট্রপড়্গ প্রকাশ্যভাবে সামরিক শক্তির মাধ্যমে একটা দেশের মানুষকে সার্বড়্গণিক নজর ও তলস্নাশীতে রাখতে পারে না| এজন্য তারা বিরাট সংখ্যক গোয়েন্দা ও খবরী এ কাজে নিযুক্ত করে|

বিভিন্ন স্ত্মরের বিভিন্ন রকমের গোয়েন্দা ও খবরী দেখতে পাবেন আপনি| মসজিদ থেকে শুরম্ন করে পতিতালয় পর্যন্ত্ম সবখানে গোয়েন্দা-খবরীদের আনাগোনা থাকে| চাকরীজীবি, মসজিদের ইমাম, চাকর, মদের বারের বিভিন্ন রকমের লোক...

এমনকি যেখানে গোয়েন্দা থাকার কোনো আশঙ্কা থাকে না, সেখানেও আপনি গোয়েন্দা ও খবরী পাবেন| এমন গোয়েন্দাও

পাবেন, যে সাধু সেজে বলবে, ‘আমি আমার প্রতিবেশীর ঘরে দেখেছি সেখানে ভবঘুরে আর অজানা আগন্তুক আসে|’

আমার দেখা একটা উদাহরণ দিচ্ছি| একটা ছোট শহর| শহরের অধিবাসী প্রায় ৫ লাখের মতো| এ ছোট শহরেও ৫০ হাজার গোয়েন্দা ও খবরী ছিল| ১০ কিলো বাই ১০ কিলো একটা শহরে এ পরিমাণ গোয়েন্দা! রাষ্ট্রপড়্গা এ গোয়েন্দাদের মাধ্যমে পুরো শহরকে ছেঁকে ফেলে| কোনো ভবঘুরে(লক্ষহীন ঘুরে), কোনো পাগলবেশী, কোনো আগন্তুকই তাদের এ ছাঁকুনি থেকে বাঁচে না|

যে কোনো যুবককেই তারা সন্দেহের তালিকায় রাখে| কোনো বাড়িতে যুবক ছিল না এতদিন| হঠাৎ করে সে কোথা আসলেই তাদের সন্দেহের তালিকায় পড়ে যায় সে| যে কোনো দুর্লভ শব্দ তাদের সন্দেহের তালিকায় পড়ার জন্য যথেষ্ট| পরিস্থিতি এতটা পর্যন্ত্ম পৌঁছে যে, যার বয়সই ৬০ এর নিচে সে সন্দেহের তালিকায় থাকে|

গোয়েন্দা ও খবরীদের এ জাল রাষ্ট্রপড়্গের বড় কাজে আসে| আর এ জালটি মুজাহিদদের জন্য বড় ঝামেলা সৃষ্টি করে| গোয়েন্দা-খবরীদের এ লেজের কারণে অপারেশন করা কষ্ট হয়ে পড়ে|

গোয়েন্দারা সরকারের বেতনভোগী কর্মচারী হয়ে থাকে। আর খবরীরা সরকারের নিয়মত কর্মচারী নয়। বরং তারা সাধারণ মানুষ। সরকারের কাছ থেকে ভাল অংকের টাকা পেয়ে তাদের জন্য কাজ করে। তাই খবরীদের নিয়ে আপনি কোনো যুদ্ধে জড়াতে পারবেন না। পারবেন না দখলদারকে ছেড়ে দিতেও। আর একই সময়ে খবরীদের উম্মাহর দেহে ড়্গায় করতে দিতেও পারেন না আপনি। ড়্গামতাবান পড়্গ থেকে এ বিরাট ভয়ানক ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় গেরিলা বাহিনীকে। চাকরীজীবি থেকে শুরম্ন করে দেকানদার পর্যন্ত্ম এ জাল বিস্ত্মৃত। গেরিলা বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য এ গোয়েন্দা-খবরীর জালই ড়্গামতাবান পড়্গের অনেক গুরম্নত্বপূর্ণ নির্ভরতার স্থল।

অবশ্যই জিহাদী আন্দোলনের সময় গোয়েন্দারা মসজিদের কোণায় কোণায় বসে থাকে। ফলে মসজিদ মুজাহিদদের জন্য অত্যন্ত্ম অনিরাপদ স্থান হয়ে পড়ে। এমনকি বাহ্যিক ইসলামী শেআরও সন্দেহের উদ্রেক করে। যুদ্ধ শুরম্ন হবার আগে যিনি পরিপূর্ণ শ্মশ্রম্নমি-ত থাকেন তাকে গেরিলা বাহিনীতে নাম লিখিয়ে নিজের দাড়ি বিসর্জন দিতে হয়। একদিনের ভেতরে শ্মশ্রম্নমি-ত থেকে শ্মশ্রম্নহীণ হয়ে যেতে হয়। কিন্তু যে সব মানুষের জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণের সুযোগ নেই, তারা এ পদ্ধতি

গ্রহণ না করে অন্যভাবে ইসলামের বাহ্যিক শেআর গোপনের চেষ্টা করেন| অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের সময় করণীয় নির্দিষ্ট কাজটি করেন|

৫. রাষ্ট্রপড়্গা সন্ত্রাস ও জুলুমের রাজনীতি অবলম্বন করবে

এটা সর্বজনবিদিত যে, বিদ্রোহ ও গেরিলা যুদ্ধ মোকাবেলার সময় মেরে না তাড়ানো রাষ্ট্রপড়্গের জন্য সবচে গুরম্নত্বপূর্ণ কাজ| অর্থাৎ এ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপড়্গের জন্য নিজকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং গেরিলা বাহিনীকে তাদের নিজদের কাজ করতে দেয়া সবচে শ্রেয়| এ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপড়্গের জন্য উচিত কাজ হচ্ছে ধীরগতিতে গেরিলা বাহিনীর বিরম্নদ্ধে যুদ্ধ করা| তাহলেই রাষ্ট্রপড়্গা সবচে উত্তম কৌশলটি গ্রহণ করেছে বলে বিবেচিত হবে| বাস্ত্মবতা হচ্ছে, অনেক রাষ্ট্রই আত্মনিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং শান্ত্মভাবে ধীরগতিতে কাজ করে যুদ্ধের সময় সংঘটিত ড়্গায়-ড়্গাতিকে পুষিয়ে নিতে সড়্গাম হয়েছে দলের বিশেষ ব্যক্তিবর্গকে শান্ত্ম করার মাধ্যমে| অর্থাৎ যে লোকটার কাছে ক্লাশনিকোভ ও গোলা-বারম্নদ ছিল তাকে রাষ্ট্রপড়্গা হত্যা না

করে গ্রেফতার করে। এভাবে একসময় গেরিলা যুদ্ধকে থামিয়ে দেয়।

কিন্তু অধিকাংশ সময় যখন গেরিলা-বাহিনী রাষ্ট্রপক্ষের একের পর এক আঘাত করতে থাকে আর রাষ্ট্রপক্ষ যখন গেরিলা-বাহিনীকে আটক করতে না পারে তখন রাষ্ট্রপক্ষ সামগ্রিকভাবে ধর-পাকড় শুরু করে, অনেক মানুষের উপর নির্যাতন করে এবং অনেক নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ফেলে। এসব ভুল যখন রাষ্ট্রপক্ষ করে বসে তখন পরিস্থিতি গেরিলা বাহিনীর জন্য খুবই সহায়ক হয়ে ওঠে। কারণ এতদিন বলে কয়ে যাদের যুদ্ধের সমর্থক বানানো গেল না, রাষ্ট্রপক্ষ যখন তাদের নির্যাতন করতে থাকে তখন তারা নির্যাতিত হয়ে নিজ থেকেই বলতে থাকে, 'আসলেই তো এরা খুব জুলুমবাজ! এমনকি আমি কোনো কিছুতে জড়িত হলাম না, তবুও এরা আমার সাথে এরকম আচরণ করছে!' এভাবে ধীরে ধীরে মানুষ গেরিলা-বাহিনীর সাথে যুক্ত হতে থাকে। রাষ্ট্রপক্ষের চালানো সন্ত্রাসই এ যোগদানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

حرب المستضعفين কিতাবে আমেরিকান লেখক উল্লেখ করেছেন যে, তিনি গেরিলা যুদ্ধে আক্রান্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে

উপদেশ দেন যে, আত্মনিয়ন্ত্রণ করে ধীরগতির কৌশল প্রয়োগ করলে সময়ের সাথে সাথে গেরিলা বাহিনী শেষ হয়ে যাবে|

কিন্তু রাষ্ট্রপড়্গা আদৌ আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে পারে না| তাই তারা সন্ত্রাস ও জুলুমের রাজনীতি প্রয়োগ করে গেরিলা-বাহিনীর মনে চিড় ধরাতে চেষ্টা করে|

সিরিয়াতে আমার দেখা ঘটনা| এক গোয়েন্দা কর্মকর্তা অথবা রাষ্ট্রপড়্গের বিশেষ এক লোক গুপ্তহত্যায় নিহত হয়| তখন একইতালে হত্যার অপারেশন চালাতে থাকে রাষ্ট্রপড়্গা| তারা একস্থানে অবস্থানরত মানুষদের একসাথে হত্যা করে ফেলে| আমি একবার বড় আশ্চর্যভাবে বেঁচে যাই তাদের হত্যাযজ্ঞ থেকে| আমি একদিন স্বাভাবিকভাবে রাস্থায় হাঁটছিলাম| এর আগে মুজাহিদরা এসে এক লোককে হত্যা করে ফেলে| ফলে রাষ্ট্রপড়্গা এসে সে অঞ্চলটা ঘিরে ফেলে এবং যাকেই পায় তাকেই হত্যা করতে থাকে| এমনকি মানুষকে বাস ও যানবাহন থেকে নামিয়ে পাইকারি ধরে মারতে থাকে| মানুষদের দোকানপাট থেকে বের করে আনতে থাকে, তাদের উপর নির্যাতন করতে থাকে| পরিস্থিতি তখন এমন দাঁড়াল যে, আপনার সাথে এগুলোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, কিন্তু

আপনাকে হত্যা করা হচ্ছে, জবাই করা হচ্ছে৷ আর রাষ্ট্রপড়্গা এ কাজটা অনেকবার করেছে৷

রাষ্ট্রপড়্গের লোকেরা এসে হত্যা করতে থাকে এভাবে৷ এমনকি কখনও পরিস্থিতি এতটাই উত্তেজনাকর হয়ে যায় যে, যে এলাকায় গুপ্তহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, সে এলাকার অধিবাসীদের ধরে এনে হত্যা করে দেয়া হয়৷

একবার তারা ওয়ান্টেড লিস্ট এনে খুঁজতে শুরম্ন করে৷ এদের তারা আগে ধরতে পারেনি৷ তাই তারা তালিকায় থাকা যোদ্ধাদের বাবা-মাকে ধরে নিয়ে যায় এবং তাদের হত্যা করে ফেলে৷ একবার ২০ জন মুজাহিদের বাবাদের নিয়ে জবাই করে হত্যা করা হয়৷

যারা গেরিলা যুদ্ধে নামতে চাই তাদের এমন পরিস্থিতির সাথে নিজদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে শুরম্নতেই৷ তাকে মেনে নিতে হবে যে, যখনই গেরিলা যুদ্ধের আমল শুরম্ন হবে তখনই এমন সন্ত্রাস ও জুলুমের রাজনীতির প্রয়োগ হবে এবং তাকে পড়তে হবে এমন পরিস্থিতিতে৷

কখনও কখনও তারা সীমা পার করে ফেলে৷ কারণ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ বলতে কিছু নেই৷ যখন সাউদি আরব বা

উপসাগরীয় কোনো দেশে গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন হবে তখন এসব দেশের সামরিক সংস্থা সেরক বীভৎসতায় পৌঁছবে না, যেমন বীভৎসতা ঘটেছে সিরিয়া, আলজেরিয়া বা মিসরে|

তারা শুরম্নতে মুজাহিদদের বাবাদের নিতে থাকে| এরপর একটা পর্যায়ে তারা মুজাহিদদের স্ত্রীদের নিয়ে যেতে থাকে বন্দী করে| এভাবে একসময় তারা আপনার মা, বোনকেও নিতে থাকবে| আর ঘোষণা করবে, আপনাকে তাদের হাতে সোপর্দ হতে হবে, নয়তো তারা আপনার মা, বোন অথবা স্ত্রীকে ছাড়বে না|

যেভাবে আপনাকে ভয় পাইয়ে দেয়া যায়, সেভাবে সে বিষয়টি তারা চর্চা করবে| প্রত্যেক সম্ভাব্য কৌশল তারা প্রয়োগ করবে গেরিলাদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করতে| এমনটা মিসরে হয়েছে, সিরিয়ায় হয়েছে, প্রতিটি স্থানে ঘটেছে| একবার তারা বন্দী বানিয়ে নিয়ে যায় পলাতকের ৪ ভাইকে| আর পলাতকের বাবাকে বলে যায়, ‘তাদের ভাই আসা পর্যন্ত্ম আমরা এদের ছাড়বো না|’

সন্ত্রাস ও জুলুমের এ কৌশল প্রয়োগের কোনো শেষ নেই, থাকে না কোনো সীমা| তারা প্রতিটি পদ্ধতিতে প্রতিটা সম্ভাব্য পন্থায় এটি প্রয়োগ করে| প্রতিটি রাষ্ট্রেই তারা এ ধারণা প্রোথিত করে

দিয়েছে যে, তারা এমনটা করতে সক্ষম। মিসরে ১৯৭৮ সালে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভ শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের ভেতরেই রাষ্ট্রপক্ষ গুলি ছুঁড়তে থাকে বিক্ষোভকারীদের উপর। মরক্কোতেও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কয়েকবার বিক্ষোভ হয়, কিছু বিক্ষোভ তো কয়েক মাস আগেও হয়েছে। রাষ্ট্রপক্ষ বিক্ষোভকারীদের উপর গুলির বৃষ্টি বর্ষায়। এতে ৩০০'র মতো মানুষ নিহত হয়।

অর্থাৎ প্রতিটি রাষ্ট্র এ বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে আছে যে, রাষ্ট্র পরিচালকরা যখনই নিজেদের অবরোধের পরিস্থিতিতে দেখবে এবং নিজদের অবস্থান দুর্বল দেখবে তখনই এমন ত্রাস ও জুলুম চর্চা করতে পারে তারা।

বিনা বাধায় লিবিয়ায় হয়েছে এমনটা। বিনা বাধায় সিরিয়ায় হয়েছে। সিরিয়ার হামা শহরে আশ্চর্য এক সীমায় পৌঁছে যায় এ বিষয়টি, সন্ত্রাস ও জুলুমের এ প্রয়োগটি। এক রাতের ভেতরেই হামা শহরটি মুজাহিদদের দখলে চলে যায়। অর্থাৎ রাতের বেলা সবাই ঘুমায় শহরটিকে রাষ্ট্রের হাতে দেখে। আর সকালে জেগে দেখে শহর মুজাহিদদের দখলে। সরকার বার কয়েক চেষ্টা করেও প্যারাকমান্ডোদের নামাতে পারল না শহরের ভেতরে।

যখনই কোনা প্যারাকমান্ডো নামার চেষ্টা করতো, তাকে শেষ করে দেয়া হতো| শহরে ঢুকে প্রতিরোধ গড়ার জন্য তারা শহরে নামতেই পারছিল না| যখনই তারা কোনো বাড়ির ছাদে নামতো কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা পড়তো|

রাষ্ট্রপড়্গা দেখল তারা এটাতে ব্যর্থ হচ্ছে| তাই তারা সরে গেল শহরের বাইরে| এরপর মর্টার ও ট্যাঙ্ক দিয়ে শহর ঘিরে ফেলল| মুজাহিদদের আত্মসমর্পণ করতে বলল| মুজাহিদরা ‘না’ বলে দিল| এদিকে রাষ্ট্রপড়্গের সেনারা শহরকে ধ্বংস করতে শুরম্ন করলো| এ ঘটনাটি গোপন করার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক একাত্মতা অর্জন করল সিরিয়া সরকার| না কোনো পত্রিকায় খবরটি এসেছে| আর না বিশ্বের কোনো রেডিওতে এ সংবাদ শুনা গেছে| ইজরাইল বা অন্য কেউ এ হত্যাকা-ের ব্যাপারে কিছুই বলেনি| যেন এমন কোনো ঘটনা ঘটেইনি!

সরকার ১৪ দিনের ভেতরে শহরটা ধ্বংস করে দিল| অনবরত মর্টার ও ট্যাঙ্ক দিয়ে বোমা মারতে থাকলো, বিমান দিয়ে বোমা হামলা চালাতে থাকলো পুরো শহরের মানুষের উপর| ১৪ দিনের ভেতরে তারা ৪০ হাজার মানুষকে হত্যা করলো|

১৪ দিন যুদ্ধ চলল| এরপর পরিস্থিতি সংকীর্ণ হয়ে গেল প্রতিটি অলিগলিতে| ৪দিনে বেঁচে থাকা বাকি লোকদের প্রতিরোধ চলল| অতঃপর অস্ত্রধারী মানুষজন যখন নিজদের পরাজয় বুঝতে পারলো, তখন তারা রাস্ত্মার উপর অস্ত্র ফেলে নিজদের কিতাল থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করল| তখনও পর্যন্ত্ম হামায় হাজার হাজার মানুষ কিতাল চালাতে থাকে| কিন্তু রাষ্ট্রপড়্গা ঘুণাড়্গরে জানতে পারে না যে, কে কিতাল করে যাচ্ছে| তাই তারা ১৫ থেকে ২০-২৫ বছরের মানুষগুলো ধরে নিয়ে হত্যা করতে থকে| এরপর ঘটনার এক সপ্তাহ পর তারা শহরে প্রবেশ করে|

সিরিয়ার মতো এ ঘটনা যে কোনো রাষ্ট্রেই ঘটা সম্ভব|

অবশ্য সিরিয়ার রাষ্ট্রপড়্গের ড়্গেত্রে একটি বিশেষ পয়েন্ট উলেস্নখযোগ্য| আর তা হচ্ছে, তাদের সেনারা নুসাইরি শিয়া| অর্থাৎ সেনারা যেহেতু নুসাইরি, তাই তারা এটা বুঝতে পারছে যে, তারা নিজদের কাউকে হত্যা করছে না| কিন্তু এমন পরিস্থিতি মিসর বা আলজেরিয়ায় নেই| তবুও দেখুন, আলজেরিয়ার সেনারা আনাবাহ শহরকে ধ্বংস করে দিল| নুসাইরিদের নিকট একটা অনুভূতি কাজ করছিল যে, তারা যাদের মারছে তারা তাদের নিজদের লোক না| যদিও সৈন্যদের

অধিকাংশরাই যারা এ অপারেশন করেছিল তারা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অংশ ছিল, তারা আদিষ্ট ছিল, অফিসাররা তাদের আদেশ দিয়েছিল ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য, তাই সে আদেশ পালনে তারা এ গণহত্যা করেছিল|

যখন কোনো দল কোথাও গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন করে, তখন এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে বলে ধরে রাখতে হবে|

৬. সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া

গেরিলা যোদ্ধাদের ঠেকাতে রাষ্ট্রপড়্গ যে কৌশলগুলো প্রয়োগ করতে পারে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, **সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া**|

পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই সাধারণ নাগরিকদের কাছে পশুপাখি শিকারের অস্ত্র থেকে শুরম্ন করে পিস্ত্মল পর্যন্ত্ম থাকতে পারে| বিশেষ করে গোত্রভিত্তিক অঞ্চলগুলোতে তো থাকেই| এক মুজাহিদের বাবার কাছে অস্ত্র ছিল| মুজাহিদরা সে অস্ত্র ধার নিয়ে অপারেশন করে এসে আবার ফিরিয়ে দিত| অস্ত্র কখনও লাইসেন্স করাও থাকতে পারে| যাই হোক রাষ্ট্রপড়্গ গেরিলা যুদ্ধের সময় নাগরিকদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে পারে|

রাষ্ট্রপড়্গা এড়্গোত্রে ৩ স্ত্মরের কৌশল অবলম্বন করবে|

ক. প্রথমের তারা ঘোষণা করবে, *দেশের নিরাপত্তার জন্য প্রত্যেকের অস্ত্র লাইসেন্স করাতে হবে| অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া নয়, বরং যার কাছেই অস্ত্র আছে তাকে লাইসেন্স করতে হবে অস্ত্রের, ব্যস| এ অবস্থায় যে ব্যক্তি অস্ত্রের লাইসেন্স করবে না, এর অর্থ হচ্ছে, তার অস্ত্র মুজাহিদ বা গেরিলা যোদ্ধারা ব্যবহার করে|*

এসময় অনেক মানুষ ভয়ে অস্ত্রের লাইসেন্স করাবে| কারণ তার সাথে তো গেরিলা যুদ্ধের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই| তাই নিজকে রাষ্ট্রপড়্গোর চোখে নিরাপদ প্রমাণের জন্য এমনটা করবে অনেকে| কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষ তখনও অস্ত্রের লাইসেন্স করবে না| যে তার অস্ত্র রাষ্ট্রপড়্গোর বিরম্নদ্ধে ব্যবহার করবে, সে অস্ত্রের লাইসেন্স করবে না|

খ. অস্ত্র ছিনিয়ে নেবার জন্য দ্বিতীয় স্ত্মরে যে কৌশলটি রাষ্ট্রপড়্গা ব্যবহার করবে তা হচ্ছে, বাড়িতে বাড়িতে আকস্মিক হানা দেবে, যার সাথে লাইসেন্স-বিহীন অস্ত্র থাকবে তাকে গ্রেফতার করবে, তাকে চূড়ান্ত্ম পর্যায়ের শাস্তি্ম দেবে| তাকে অস্ত্রবহনের অপরাধের উপযোগী শাস্তি্মর চেয়ে বহুগুণ বড় শাস্তি্ম দেবে| যেমন, হত্যা করে ফেলবে, ২০ বছরের জন্য

জেলে পুরে দেবে। এ সময়টায় এসে মানুষ ভয় পাবে। যারা আগে অস্ত্রের লাইসেন্স করেনি তারা লাইসেন্স করানোর জন্য উঠে পড়ে লাগবে।

গ. এরপর আসবে তৃতীয় স্তর। এ স্তরে রাষ্ট্রপড়্গা ঘোষণা দেবে, নিরাপত্তা কন্ডিশনের কারণে সবার কাছ থেকে অস্ত্র জমা নেওয়া হবে।

গোত্রভিত্তিক অঞ্চলের গোত্রগুলোর কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়া বিরোধের কারণ। এখন তা ঘটছে ইয়ামানে। রাষ্ট্রপড়্গা বিপদে যেন পড়তে না হয়, সেজন্য গোত্রগুলোর কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নিচ্ছে তারা।

এমন কিছু দেশ আছে, যে দেশে প্রায় পূর্ণরূপে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। মরক্কোর মতো দেশের পুরো দেশ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। আপনি সেখানে অস্ত্রের একটি টুকরোও পাবেন না।

কিন্তু এমনও দেশ আছে, যে দেশের রাষ্ট্রপড়্গা অস্ত্র ছিনিয়ে নিতে সড়্গাম হয়নি। আপনি সেখানে সাধারণভাবে অস্ত্রের প্রচলন দেখবেন। যেমন, লেবানন, সিরিয়া, আলজেরিয়া, চাদ, মালি। এসকল অঞ্চলে অনেক অস্ত্র আছে।

মোটকথা, গেরিলা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপক্ষ অস্ত্র হাতিয়ে নেবে, ছিনিয়ে নেবে। তাই আপনি যখন গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবেন কোথাও, তখন আপনাকে অগ্রিম অস্ত্র মজুদ করার কথা চিন্তা করতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, মানুষের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার আশঙ্কা আছে গেরিলা পরিস্থিতি তৈরি হবার পর।

৭. মুজাহিদদের নিঃসঙ্গ ও জনবিচ্ছিন্ন করার নিমিত্তে প্রবলভাবে মিডিয়া যুদ্ধ করা

এ পয়েন্টটি গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্র ও গেরিলা উভয় পক্ষ নিজদের বৈধতা নিয়ে যুদ্ধ করবে মিডিয়া দিয়ে। উভয় পক্ষই মানুষকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা চালাবে যে, তারাই হচ্ছে বৈধ, আর বিপরীত পক্ষ অবৈধ। রাষ্ট্রপক্ষ যখন জনসাধারণকে বুঝাতে সক্ষম হবে যে, রাষ্ট্রপক্ষই হচ্ছে বৈধ, তখন তারা গেরিলা ও মুজাহিদদের জবাই করতে পারবে অনায়াসে জনসাধারণের সামনে সবার সন্তুষ্টির মাঝে।

সম্ভবত আলোচনার এ অংশটি পুরো আলোচনার মধ্যে সবচে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ মিডিয়া ও জনসাধারণের মনস্তত্ত্বে

সবচে গুরম্নত্ববহ| যে পড়্গা জনসাধারণের মনস্ত্মত্ত্ব অর্জন করতে পারবে, সে পড়্গা গেরিলা যুদ্ধে বিজয়ী হবে|...

কারণ মুজাহিদ বা গেরিলারা যখন জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, গণমানুষ যখন মুজাহিদ-গেরিলাদের প্রতি পরিতুষ্ট থাকবে না, তখন সংখ্যায় তারা যতই হোক না কেন কোনো লাভ হবে না| ধরা যাক, গেরিলারা সংখ্যায় ২০০-৩০০-৪০০ জন| যুদ্ধের মাঝে তাদের দিন অতিবাহিত হবে| প্রতিদিন তারা পাঁচ-দশজন করে নিহত হতে থাকবে| একদিন তাদের অস্ত্মিত্ব বিলীন হয়ে যাবে এভাবে|

তাই রাষ্ট্রপড়্গা সবসময় গণমানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করবে যে, ‘রাষ্ট্রপড়্গাই হচ্ছে বৈধ’| আর গেরিলাদের অবৈধ বানানোর চেষ্টা চালাতে থাকবে| যেমনটা বর্তমানে রেডিওসহ অন্যান্য মাধ্যমে নজিব করছে| নজিব চেষ্টা করছে আফগানের মানুষদের বুঝাতে যে, সে-ই হচ্ছে বৈধ| অন্যদিকে মুজাহিদরা চেষ্টা করছে আফগানদের বুঝাতে যে, তারাই হচ্ছে বৈধ আর নজিব হচ্ছে কাফের|

মিডিয়া যুদ্ধে এসে রাষ্ট্রপড়্গা তার সমস্ত্ম কৌশল প্রয়োগ করবে| এড়্গেত্রে আমরা একটি বিষয় উলেস্নখ করতে পারি যে,

আমাদের মাথার উপর চেপে বসা এ রাষ্ট্রপড়্গা এ ড়্গোত্রে পুরোপুরিই রিক্তহস্ত্ম। আলহামদুলিলস্নাহ। মানুষের মাঝে প্রজন্ম পরম্প রায় একটা আত্মিক অবস্থা বিরাজমান থাকে যে, পৃথিবীর সমস্ত্ম মানুষ ড়্গমতাবানদের কোনো কারণ ছাড়াই ঘৃণা করে। এমনকি কোথাও গেরিলা পরিস্থিতি না থাকলেও মানুষ সরকারপড়্গকে ঘৃণা করে। অর্থাৎ আপনি মানুষকে দেখবেন তারা কোনো যুক্তি ছাড়াই রাষ্ট্রপড়্গের যে কাউকে ঘৃণা করে। সরকারপড়্গের মাঝে ও কারো মাঝে কোনো রূপ সমস্যা না থাকলেও সরকারপড়্গকে মানুষ এমনিতেই অপছন্দ করে। এটা গেরিলা বাহিনীর পড়্গে খুবই উপকারী। গেরিলাদের অবস্থান দৃঢ় করার জন্য সহায়ক।

কিন্তু গেরিলাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট নয়। আপনার জন্য অপরিহার্য যে, আপনি মানুষকে পরিতুষ্ট করবেন যে, ‘আপনার কাজটা বৈধ ও যৌক্তিক। আপনার কঠোরতা, আপনার অস্ত্রের ব্যবহার যৌক্তিক। যদি জনসাধারণ মুসলিম হয়, তবে আপনাকে তাদের পরিতুষ্ট করতে হবে যে, শরয়ী যৌক্তিক কারণেই আপনি কঠোরতা করছেন, শরয়ী যৌক্তিক কারণেই অস্ত্রের ব্যবহার করছেন। আর যদি জনসাধারণ অমুসলিম হয়, তবে তাদের পরিতুষ্ট করতে হবে যে, বুদ্ধির বিচারে, দেশপ্রেমের

বিচারে, বাস্তবিক বিবেচনায় বা কল্যাণ বিবেচনায় আপনার অবস্থান ও অস্ত্রের ব্যবহার যৌক্তিক। মানুষকে পরিতুষ্ট করতে হবে যে, আপনার এ লড়াই তাদের পক্ষে, তাদের থেকে শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য আপনি এ লড়াই করছেন, তাদের প্রতিনিধি হয়ে আপনি এ লড়াই লড়ছেন।

কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষ চাইবে এ পরিস্থিতি নিজের পক্ষে টেনে আনতে। সর্বদা প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে যে, গেরিলারা প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। গেরিলারা বিদেশী রাষ্ট্রের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। এভাবে রাষ্ট্রপক্ষ সীমাহীনভাবে মিডিয়ায় বিভিন্ন ধরণের কৌশল প্রয়োগ করবে, বিভিন্নভাবে মানুষকে বোকা বানিয়ে নিজেদের পক্ষে নেবার চেষ্টা চালাবে। রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা থেকে শুরু করে সবকটি মাধ্যম ব্যবহার করবে।

যখন আপনি মিডিয়ার মাধ্যমে বলার চেষ্টা করবেন যে, আমরা জিহাদের জন্য লড়ে যাচ্ছি, মুসলিমদের পক্ষে লড়ে যাচ্ছি। তখন আপনি দেখবেন মিডিয়ায় প্রচার হচ্ছে, রাষ্ট্রপ্রধান অনেক অনেক নামাজ পড়েন, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খুব ধার্মিক। টিভিতে উঁকি দিলে দেখবেন যে, রাষ্ট্রপ্রধানের তো ইবাদতের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই! এমনকি রাষ্ট্রপ্রধান তো ইবাদত

করতে করতে সাহাবী হয়ে গেছেন! তিনি দাড়ি বড় করছেন| মুহতারাম বনে গেছেন|

একই সময়ে তারা দেখানোর চেষ্টা করবে যে, মুজাহিদরা চুরি করে, ডাকাতি করে, নাজায়েজ কর্মকা- লিপ্ত হয়| এ কাজ হাসিল করতে কেমন মানুষ প্রয়োজন তাদের? অবশ্যই তাদের আলেম-উলামা প্রয়োজন| আর রাষ্ট্রপড়্গতো সর্বদাই এক বড় পরিমাণে আলেম বশীভূত করে রাখে| যেখানেই জিহাদ ও প্রতিবাদ হয়, সেখানেই এমন আলেমরূপী পাচাটা গোলাম পাওয়া যায়|

মিসরে জিহাদ শুরম্ন হওয়ার আগে ও কোনো কিছু ঘটার আগে যখন মানুষ চিন্‍ত্মা করছিল যে, তারা রাষ্ট্রপড়্গকে প্রতিহত করবে, রাষ্ট্রপড়্গের বিরম্নদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে| তখন মিসরের ৬ জন বড় বড় আলেম একত্রিত হয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করলেন যে, *‘এরকম কার্যক্রম তথা জিহাদী কার্যক্রম অযৌক্তিক| ইসলাম এটা প্রত্যাখ্যান করে| ইসলাম কঠোরতার দিকে আহ্বান করে না| বরং ইসলাম হিকমত ও মাওয়ায়েজে হাসানাহর দিকে আহ্বান করে|’* এ বিবৃতিতে সে ৬ জন আলেমের কথা এ পর্যন্‍ত্ম পৌঁছে যে, *আমরা জানি না যে,*

মিসরের কোনো শাসক আলস্নাহর বিরোধী হয়ে কোনো আইন করেছে কিনা।

এ বিবৃতির উপর স্বাড়্গার করেন মিসরের ৬ জন বড় আলেম: শাইখুল আযহার মুহাম্মাদ তানতাবী, মুফতিউল জামহুরিয়া জাদুল হক আলী জাদুল হক, মুহাম্মদ আত-তাইয়িব আন-নাজ্জার, আরো আছেন শা'রাবী, গাজালী, কারজাবী।

তবে আমি শুনেছি কোন এক ম্যাগাজিনে কারজাবী এ বিষয়টির সাথে তার সম্প র্কহীনতার ঘোষণা করেছেন। বলেছেন, তিনি ৪ ঘণ্টা যাবৎ সেখানে বসে ছিলেন কিন্তু বিবৃতির সাথে একাত্মতা পোষণ না করেই বেরিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাকী তার নাম বিবৃতিতে সংযুক্ত করে দেন। এটা হচ্ছে কারজাবীর বক্তব্য।

তবে গাজালী ও শা'রাবী বিবৃতির সাথে একাত্মতা পোষণ করেন। তারা দুজন ও অন্যরা বিবৃতিটি রচনা করেছিলেন। এমনকি শা'রাবী বিবৃতিটি টেলিভিশনে পড়েছিলেন। এখন আপনারা কল্পনা করে দেখুন, ইসলামীদের প্রতিরোধ করার জন্য আলেম শ্রেণীর কতটা প্রয়োজন পড়ে রাষ্ট্রপড়্গের।

সাউদি আরবে জুহাইমানের ঘটনাটি ঘটল।[২] সাধারণ দৃষ্টিতে তাকালেও এ বিষয়টি ইজতেহাদের ড়্গেত্রে চরম ভুল ছিল। শুরম্ন থেকে শেষ পর্যন্ত্ম বিষয়টি ভুলে ভরা। তবে যে কৌশলে পুরো ঘটনাকে বিকৃত করা হয়েছে, আলিমদের কাছ থেকে ফতোয়া বেরিয়েছে। এমনকি সেখানে অবস্থানরত অধিক পরিচিত সিরিয়ান সাবুনীর মতো আলেম ও অন্যরা অনেক কিতাবাদি লিখলেন, বিবিধ প্রকাশনা প্রকাশ করলেন। এভাবে তারা সে লোকটাকে দ্বীন থেকে বের করে দিলেন। তাকে জানিয়ে দিলেন যে, তার সাথে দ্বীনের কোনো সম্প র্ক নেই।

রাষ্ট্র বৈধতাকে একদিকে নিয়ে যাবে। আপনাকে অন্যদিকে সে বৈধতাকে নিয়ে আসতে হবে। উভয়ে তো আর বৈধ হতে পারে না। একপড়্গাই বৈধ হবে। আপনাকে জেনে নিতে হবে যে, এ অবস্থায় আপনাকে বিকৃত করে, আপনার লড়্গ্য ও উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে উপস্থাপন করা হবে। আর বিরাট একদল গণমানুষের মস্তিত্মষ্ক নিয়ে খেলা চলবে। তারা মিডিয়াকে বিশ্বাস করবে। বিশেষ করে তখনও এমন অনেক আলেম থাকবে যারা

---

[2] RynvBgvb DZvBex| g°vq nvivg kix‡d nvgjv K‡i `jejmn| KviY Zv‡`i wek¦vm wQj Zv‡`i ga¨Kvi gynv¤§v` Avãyjøvn Avj-KvnZvbx bvgavix †jvKUv cÖwZwÿZ gvn`x| Avi AwP‡iB g°vq nvivg kix‡d Zvi evBAvZ msNwUZ n‡e|

মানুষের নিকট নিষ্কলুষ চরিত্রের বলে পরিচিত থাকবে| এরা বিশেষ প্রভাবকর হবে|

৮. গেরিলাদের অর্থযোগান ও রসদ সরবরাহের উৎস নস্যাৎ করে দেওয়া|

যেমনটা কম্যুনিস্টরা আফগানিস্থানে করেছিল| তারা মুজাহিদদের কাছে আসা সাহায্য ও সম্পদের সরবরাহ থামিয়ে দেয় রাস্থা ও পুল বন্ধ করে|

যে স্থানেই গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন হয়, সে স্থানেই রাষ্ট্রপড়া এ কৌশলটি প্রয়োগ করে| বর্তমানে জামাআতুন নাহদা আলজেরিয়ায় রয়েছে| তিউনিসিয়ার সরকার চেষ্টা করে আলজেরিয়ার সাথে সীমান্থ সম্পর্কটা যেন বিচ্ছিন্ন রাখতে পারে| যাতে করে বিদ্রোহীদের কাছে সাহায্য পৌঁছতে না পারে| তারা চেষ্টা করবে রসদ ও অনুদানের উৎস জানার জন্য, চেষ্টা করবে জানার জন্য যে, কারা দেয় এ অনুদান| যাতে করে অনুদান বন্ধ করে দিতে পারে| যখন তারা জানতে পারে যে, কারা অনুদান দিচ্ছে, তখন তারা সন্ত্রাস ও জুলুমের কৌশলটি প্রয়োগ করে|

অর্থাৎ সম্প দ, অনুদান, রসদ, অস্ত্র-বারম্নদ ইত্যাদির উৎসগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপড়্গা যে সকল পদড়্গেপ গ্রহণ করে তা হচ্ছে, সীমান্তে ও বিমানবন্দরে রম্নখে দেওয়া| যোগানদারদের প্রতিহত করা| আন্দোলনকে স্তিমিত করা| ব্যবসায়ীদের রম্নখে দেওয়া| এগুলোই অনুদান ও রসদ বন্ধ করার ড়্গেত্রে তাদের প্রধান কৌশল হয়|

তবে সিরিয়া ও কিছু অঞ্চলে রাষ্ট্রপড়্গা সবচে ঘৃণ্য ও অধিক সফল কৌশলটি ব্যবহার করেছিল| রাষ্ট্রপড়্গা যখন জানতে পারলো যে কিছু মুসলিম ব্যবসায়ী জিহাদের জন্য আর্থিক অনুদান দেন| তখন রাষ্ট্রপড়্গা বিস্তারিত তথ্য দিয়ে গাল ভরা দাড়ি ওয়ালা কিছু যুবক গোয়েন্দাকে পাঠায়| তারা মুজাহিদদের মতো করে অনুদান যোগাতে থাকে ব্যবাসায়ীদের কাছ থেকে| এরপর একদিন হঠাৎ করে সে সব ব্যবসায়ী নিজদের কারাগারে আবিষ্কার করে| তখন ব্যবসায়ীরা সন্দেহ করতে থাকে যে, মুজাহিদদের মধ্যকার যাদের তারা অনুদান দিয়েছিল, তাদেরই কেউ গ্রেফতার হয়ে টর্চারসেলে দুর্বল হয়ে রাষ্ট্রপড়্গের কাছে তাদের কথা বলে দিয়েছে| এরপর থেকে ব্যবসায়ীরা অনুদান দিতে ভয় পেতে শুরম্ন করে| অতঃপর যখন ব্যবসায়ীরা জানতে পারল যে, আসলে রাষ্ট্রপড়্গাই তাদের বিরম্নদ্ধে এ কৌশলটি

অবলম্বন করেছিল, তখন তাদের কাছে যে-ই অনুদান চাইতে আসতো, তাকে সন্দেহ করতো তারা|

এভাবে ধীরে ধীরে গোয়েন্দা সংস্থা ব্যবসায়ীদের থেকে আসা অনুদানের পথ বন্ধ করে দেয় একেবারে চরম সীমা পর্যন্ত্ম| অনুদানের এ খাতটি বন্ধ হয়ে যায়| কোনো ব্যবসায়ীই আর এক পয়সা অনুদান দেওয়ারও সাহস করে না| কারণ তারা দেখেছে যারা অনুদান দিয়েছে তাদের গ্রেফতার করে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে| এমনও ঘটেছে যে, এক লোক কেবল অর্ধ লিরা অনুদান দেওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে|

রাষ্ট্রপড়্গের এক নিকৃষ্ট কৌশল এটি| তারা গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দেয় তাদের মাঝে যারা মুজাহিদদের জন্য অনুদান জোগাড় করে থাকে|

৯. গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্ব পর্যায়ের লোকদের উপর আক্রমণ করা এবং তাদের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের গুপ্তহত্যার চেষ্টা করা

যুদ্ধের একটি বিশেষ কৌশল এখন আমরা আলোচনা করবো| কুরআনুল কারীমও সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে|

কুরআনে বলা হয়েছে, فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ (অতএব তোমরা কাফের নেতাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করো)[৩] যখন আপনি কাফেরদের মূলমাথায় আঘাত করবেন তখন তার অনুসারীরা পরাজয় স্বীকার করে নেবে| রাসুল সা. একবার শুনলেন এক লোক - সম্ভবত তার নাম আব্দুল কাইস- তাঁর বিরূদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে, রাসুল সা. সাহাবীদের বললেন, 'নিশ্চয় অমুক ব্যক্তি অমুক স্থানে আমার বিরূদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করছে তোমাদের মধ্যে কে আছো যে তার মাথা নিয়ে আসবে? তখন একদল সাহাবী গেলেন এবং সে লোকটাকে হত্যা করলেন| সে বাহিনী ছিল ১০ হাজার সৈন্যের| কেবল বাহিনীর প্রধানকে হত্যা করার ফলে বাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং পুরো সমস্যাটির সমাধান হয়ে যায়|[৪]

আমাদের অবশ্যই এ কৌশলটা খেয়াল রাখতে হবে| কখনও কখনও গেরিলারা দীর্ঘ এক যুদ্ধে জড়িয়ে যায় কোনো কারণ ছাড়াই| কিন্তু যদি তারা যুদ্ধের শুরতেই রাষ্ট্রপ্রধান, ৫/৬ জন

---

[3] m~iv ZvIev : 12|

[4] m¤¢eZ kvBL Avey gymAve GLA‡b mvnvex Avãyjøvn web DbvBm iv. Gi K_v e‡j‡Qb| ivmyj mv. Zv‡K Lvwj` web ûhvBjx‡K nZ¨v Kivi Rb¨ cvwV‡qwQ‡jb| cy‡iv NUbvwU Bgvg Avngv` in. Zuvi gymbv‡` D‡jøL K‡i‡Qb|

মন্ত্রী ও ৩০ জন পার্লামেন্ট সদস্যকে হত্যা করে ফেলে| তবে দেশের ভেতরে নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে আর যুদ্ধের শুরম্নতেই গেরিলা ও সরকারী উভয় বাহিনী সমান সমান হয়ে যাবে|

রাষ্ট্রপড়্গ এ কৌশল ভালো করেই জানে| তাই তারা আফগানের ময়দানে আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বপ্রথম শাইখ আব্দুলস্নাহ আযযাম ও অন্য নেতাদের টার্গেট করে| আরব মুজাহিদ জামাআতের মধ্যকার ৪/৫ মানুষ| যদি এ ৪/৫ জনকে শেষ করে দেয়া হয়, তবে পুরো জামাআতকে ঝেড়ে ফেলা যায়| এমনটাই রাষ্ট্রপড়্গের চিমত্মা|

তারা জামাআতের প্রধানকে টার্গেট করে| হয় জেলে বন্দী করে রাখে| যেমনটা করেছিল আব্বাস মাদানীর বেলায়| তারা আব্বাস মাদানীকে গ্রেফতার করে তাকে বন্ধী করে রাখে, তার উপর নির্যাতন করে আনন্দ লুটতে থাকে| অথবা তারা হত্যা করে জামাআত প্রধানকে| অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে| যেমনটা আলস্নাহ তাআলা বলেছেন, **لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ** (তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে কিংবা নির্বাসিত

করবে।)[5] অর্থাৎ এভাবেই তারা নিজদের মনস্কামনা পূরণ করে সন্তুষ্ট হবে।

রাষ্ট্রপড়া গেরিলা বাহিনীর মাঝে তাদের গুপ্তচর ঢুকিয়ে দেবে। উদ্দেশ্য হবে গুপ্তহত্যা করা। তাই একটা গেরিলা বাহিনীর উপর আবশ্যক হচ্ছে, এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। নেতৃবৃন্দ এবং দায়িত্বশীলদের কাজের ক্ষেত্রে সাবধানতা ও নিরাপত্তায় ঘিরে রাখা। এমনকি যুদ্ধের প্রথম দিকেও জামাআতের সামনে সরাসরি তাদের না আনা।[6]

এগুলোই হচ্ছে সে সব প্রসিদ্ধ কৌশল, যা রাষ্ট্রপড়া গেরিলা বাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য প্রয়োগ করে থাকে।

سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك

---

[5] m~iv Avbdvj : 30|

[6] 19 †cBR Aviex|

দ্বিতীয় আলোচনা

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين و الصلاة والسلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

এ পর্যন্ত যা আলোচিত হয়েছে -

গেরিলা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরিস্থিতি ও গেরিলা বাহিনীদের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষের গৃহীত কলা-কৌশলের সারসংক্ষেপ

ইতোপূর্বে আমরা 'গেরিলা যুদ্ধের চিন্তাধারা' নিয়ে সাধারণ ও সার্বজনীন দিক থেকে কথা বলেছিলাম। **আমি একটা নোট প্রস্তুত করেছি, এখানে ৩০ থেকে ৪০টির মতো পয়েন্ট আউট করেছি।** সেগুলো নিয়ে আমাদের আলোচনা এগোবে।

সাধারণত যে সব পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সে সব পরিস্থিতি বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে কথা শুরু করেছিলাম

আমরা।[৭] বলেছিলাম, ৩টি পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয় একটি অঞ্চলে:

১. যখন বহিঃস্থ কোনো শক্তি প্রত্যক্ষভাবে কোনো দেশ দখল করে নেয়, রাষ্ট্রপরিচালনাকারী শক্তিকে নামিয়ে দেয় ক্ষমতা থেকে এবং রাষ্ট্রক্ষমতাকে পুরোপুরি নিজের হাতে নিয়ে নেয়। যেমন ফ্রান্স ও ইংরেজদের ইসলামী বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কৃত দখলদারিত্ব।

২. বাহিরের কোনো শক্তি যখন স্থানীয় রাষ্ট্রপরিচালনকারীর আড়াল নিয়ে কোনো দেশ পরোক্ষরূপে দখল করে নেয়। যেমন, আফগানিস্থানে সোভিয়েতের প্রথমে রূপক দখলদারিত্ব। দক্ষিণ কোরিয়ায় আমেরিকার দখলদারিত্ব। ল্যাটিন আমেরিকায় আমেরিকার দখলদারিত্ব। আর বর্তমানে আমরা দেখছি জাযিরাতুল আরবে আমেরিকার দখলদারিত্ব। আমেরিকান, পশ্চিমা ও ইহুদী সৈন্যরা জাযিরাতুল আরবকে দখল করেছে স্থানীয় রাষ্ট্রপরিচালনাকারীদের আড়াল নিয়ে। যে ব্যাপারে সৌদি সরকার বলছে যে, 'আমরাই আমেরিকান সৈন্যদের ডেকেছি।

---

[7] Av‡jvPbvi G mg‡q GK fvB kvB‡Li K_v †K‡U miKvix-`ievix Av‡jg I Zv‡`i ZvKwdi Kivi wel‡q cÖkœ K‡ib| kvB‡Li †`qv †m cÖ‡kœi DËiwU Avgiv G eB‡qi †k‡l Ômshyw³ 2Õ G D‡jøL K‡iwQ|

তারা আমাদের অনুমতিতে এখানে এসেছে। এখানে তাদের কর্তৃত্ব নয়, বরং আমাদের কর্তৃত্ব।’

যেমনটা এর আগে লেবাননে ঘটেছে। লেবাননের সরকার সিরিয়া ও ইসরাইলের অনুগত ছিল। সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে লেবাননে অনুপ্রবেশ করতে বলা হয়। সিরিয়ার সেনাবাহিনী লেবাননে প্রবেশ করে এবং একটা দখলদার সৈন্য যা যা করে তার সবটাই করে তারা। কিন্তু এসবই হয় স্থানীয় সরকারের আড়াল নিয়ে। স্থানীয় বৈধ সরকার সবসময় বলে, ‘রাষ্ট্র পরিচালকদের অনুমতিতেই তারা এসেছে।’

৩. আমরা বলেছিলাম যে, স্থানীয় জালেম সরকারের জুলুমে ভরা পরিস্থিতিতে গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন হয়। যেমনটা বর্তমানে ইসলামী বিশ্বের প্রতিটি দেশে দেখা যাচ্ছে। উদহারণত সিরিয়ায় বিদ্রোহ হয়েছে নুসাইরিদের বিরদ্ধে আশির দশকে। তাই বলা যায়, বহিরাগত শক্তি আক্রমণ না করলেও স্রেফ স্থানীয় শাসনের বিরম্নদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এরপর আমরা উলেস্নখ করেছিলাম যে, একটা রাষ্ট্রে যখন গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন হয়, তখন গেরিলাদের প্রতিরোধে রাষ্ট্রপড়্গ

কিছু কৌশল অবলম্বন করে| আমরা এখানে সেগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি:

১. বিভিন্ন শহরে সুসংহত সামরিক কেন্দ্র স্থাপন|

২. প্রধান প্রধান সড়কে নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ টহল|

৩. কিছু এলাকায় আকস্মিক টহল করতঃ এলাকাকে ঘিরে নেওয়া এবং পুরো এলাকা তলস্পর্শী করা|

৪. রাষ্ট্রপড়্গা গোয়েন্দা ও খবরীদের ভয়ানক জাল বিস্ত্মার করে|

৫. রাষ্ট্রপড়্গা সন্ত্রাস ও জুলুমের রাজনৈতিক চাল চালে| যা অধিকাংশ সময় সামরিক ব্যর্থতার ফলে করে থাকে রাষ্ট্রপড়্গের লোকেরা| এসময় রাষ্ট্রপড়্গেরা সৈন্যরা সাধারণ মানুষের উপর জুলম করতে থাকে এবং গেরিলা যুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন লোকদের উপর নির্যাতন করতে থাকে|

৬. নাগরিকদের কাছ থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয় রাষ্ট্রপড়্গা| প্রথমে নাগরিকদের হাতে থাকা অস্ত্র লাইসেন্স করে নিতে বলে| এরপর লাইসেন্সকৃত অস্ত্র জমা করে নেয়| এভাবে মানুষের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয় সরকারপড়্গা|

৭. ব্যাপক আকারে মিডিয়া যুদ্ধ চালাতে থাকে গেরিলা বাহিনীর বিরম্নদ্ধে এবং গেরিলা বাহিনীকে জনবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত করে। এজন্য রাষ্ট্রপড়্গ রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা ও সমাজের জ্ঞানী-গুণী ও আলেমদের ব্যবহার করে। এভাবে করে রাষ্ট্রপড়্গ নিজকে বৈধ ও সঠিক প্রমাণ করে। এবং গেরিলা বাহিনীকে অবৈধ ও বেঠিক প্রমাণ করে।

আমরা বলে এসেছি যে, গেরিলা ও রাষ্ট্র উভয় পড়্গই নিজদের বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করে এবং অপরপড়্গকে অবৈধ প্রমাণের চেষ্টা করে। পরিশেষে যে পড়্গ জনসাধারণকে নিজের পড়্গে নিতে পারে -বস্তুজগতের বিবেচনায়- তারাই যুদ্ধে সফল হওয়ার চাবি নিজের হাতে পেয়ে যায়। গণমানুষ যার পড়্গ নেয় পরিশেষে সে পড়্গই বিজয়ী হয়।

রাষ্ট্রপড়্গ যুদ্ধে বিজয়ী হয় যদি তারা গণমানুষকে তুষ্ট করতে পারে যে, তারাই হচ্ছে বৈধ ও সঠিক। যেমনটা বর্তমানে জাযিরাতুল আরবে ঘটছে। যদিও জাযিরাতুল আরবে গেরিলা যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং প্রতিহত করার উপাদানও প্রস্তুত আছে। কিন্তু সেখানে গেরিলা যুদ্ধ এখন করা সম্ভব না। কারণ রাষ্ট্রপড়্গ গণমানুষকে নিজদের পড়্গে নিয়ে গেছে। এখন

যদি কেউ প্রতিরোধ যুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তবে তার জন্য ফতোয়া প্রস্তুত আছে। দারবারী আলেমরা প্রস্তুত আছেন। আর জনসাধারণের মন-মস্তিষ্কও সে সব ভুলভাল গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। যখন কয়েকজন প্রতিরোধ যুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাবে, তখন এ মুজাহিদদের বিদ্রোহী খারেজী বানিয়ে ফেলা হবে। বলা হবে এরা খারেজী, এরা শরয়ী উলুল আমরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেরিয়েছে। এমনকি এটারও আশঙ্কা আছে যে, বড় বড় জ্ঞানী আলেমরা সেভাবে ফতোয়া দেবে যেভাবে সরকারপন্থা চাইবে।

এখান থেকে বুঝে আসে যে, এটিই সে প্রধান সমস্যা, যার কারণে জাযিরাতুল আরবের অনেক মুজাহিদ তাৎক্ষণিক কোনো কিছু করা থেকে বিরত আছেন। কারণ তারা জানেন যে, 'মানুষ তাদের কাতারে নেই। মানুষের একটা বড় পরিমাণ এখনও সঠিক ধারণা থেকে দূরে।' যখন বুশ অসুস্থ হয়, তখন তার সুস্থতার জন্য জাযিরাতুল আরবের কিছু মানুষ দোআও করে। একবার কিছু মুজাহিদ একটা অপারেশন করে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। তখন মানুষজন অনায়াসে জিজ্ঞাসা করা ব্যতীতই পুলিশ, সেনা ও নিরাপত্তা বাহিনীকে বলে দিচ্ছে যে, মুজাহিদরা কোন দিকে গেছে। তারা বলে, গাড়িটি এ দিক দিয়ে গেছে।

চিন্তা করে দেখুন, একজন মানুষ নিজের দেশের কোনো নিরাপত্তাকর্মীকে গুলি করেনি, গুলি করেছে একটা আমেরিকানের উপর; আর সেখানকার মানুষজন যে গুলি করেছে তাকে ধরে সোপর্দ করে দিল। এটাই হচ্ছে মিডিয়ার ফলাফল। যার মাধ্যমে মানুষের অন্তর নিজের কব্জায় নিয়ে নেয় রাষ্ট্রপড়্গা। আর মানুষের অন্তরই প্রতিটি পরিস্থিতিতে কৃত কাজের আসল কর্তা।

৮. গেরিলা যোদ্ধাদের অর্থ ও রসদ যোগান বন্ধ করে দেওয়া।

৯. মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃবৃন্দ ও প্রধান লোকগুলোর উপর আক্রমণ ও গুপ্তহত্যা চালানো।

এক ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, গেরিলা বাহিনী কীভাবে এসব কৌশল প্রতিহত করতে পারে? আসলে এসব কৌশল অকেজো করার উত্তর একটা একটা করে দিতে হবে। অর্থাৎ যদি আপনি প্রশ্ন করেন যে, কীভাবে রাষ্ট্রপড়্গের মিডিয়াশক্তির মোকাবেলা করা যায়? তবে আপনার মনে উত্তর উদয় হবে যে, রাষ্ট্রপড়্গের হাতে টেলিভিশন আছে। তাই আপনাকে বিবিধ প্রকাশনা, খুতবা-বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষকে সচেনত করতে হবে, মানুষকে জাগাতে হবে।

আপনাকে রাষ্ট্রপড়োর বিপরীত একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

- রাষ্ট্রপড়া গোয়েন্দাদের ছড়িয়ে দেয়। তাহলে আপনি কী করবেন? আপনি গোয়েন্দাদের হত্যা করবেন এমনভাবে যেন প্রতিটি গোয়েন্দার মনে ভয় ঢুকে যায়, এ হত্যার মাধ্যমে ত্রাস সৃষ্টি হয় তাদের মনে। এভাবে আপনি গোয়েন্দাদের দমন করবেন। যদিও যুদ্ধ দীর্ঘ হবে কিন্তু এদের অবশ্যই ভয় পাইয়ে দিতে হবে, তাদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারী আলেমদের ইস্যুটিতে আসা যাক। তাদের মধ্যে কতক ভাল, কতক অর্ধেক ভাল, আর কিছু আছে প্রবঞ্চিত। আপনি তাদের মধ্য থেকে সবচে নিকৃষ্টজনকে বাছাই করবেন, যার নিকৃষ্ট হওয়ার ব্যাপারে কারো মাঝে মতানৈক্য থাকবে না। তাকে ভয়ানক পদ্ধতীতে হত্যা করবেন। আপনি এ কাজের জন্য এমন কাউকে বাছাই করবেন না, যার ব্যাপারে মানুষ মতানৈক্য করতে পারে। সরাকারী আলেমদের মধ্যকার প্রসিদ্ধ কিছু ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যারা সাধারণ মানুষের মাঝে, মুসলিমদের মাঝে বদনামে কুখ্যাত। আপনি তাকে বাছাই করে এ কৌশলটি তার উপর প্রয়োগ করবেন। আর এ ঘটনার মাধ্যমে অন্য

সরকারী আলেমরা শিড়্গা পেয়ে যাবে| আর রাষ্ট্রপড়্গের এ কৌশলগুলো স্বাভাবিকভাবেই একসময় আপনার বিরম্নদ্ধে আসবে|

গেরিলা-জিহাদী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য ও কলা-কৌশল

এ অংশে আমরা যে গুরন্নত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করবো তা হচ্ছে, গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল| অর্থাৎ সে সকল কৌশল নিয়ে আমাদের এবারের আলোচনা, যে সকল কৌশল গেরিলা বাহিনী তার যুদ্ধ পরিচলনায় প্রয়োগ করবে| আলোচনার কিছু অংশ সংড়্গিপ্ত হবে| যেখানটাতে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়বে, সেটা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস থাকবে|

আমি যে নোটটি প্রস্তুত করেছি, সে নোটে আছে, যার ব্যাপারে পূর্বে আমরা ইঙ্গিত দিয়েছি যে, **জিহাদী গেরিলা বাহিনী তখনই অগ্রসর হবে, যখন গেরিলা যুদ্ধ করার মতো প্রস্তুতি বিদ্যমান থাকবে|** গেরিলা যুদ্ধের এক বিশেষজ্ঞ حرب المستضعفين বইয়ে উলেস্নখ করেছেন, **'গেরিলা যুদ্ধ তখনই দাঁড়াতে পারে যখন তার সফলতার জন্য সরঞ্জাম ও আসবাব বিদ্যমান থাকে|'**

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখছি, حرب المستضعفين বইটি সবাইকে পড়ার নসিহত করছি| পেশাওয়ারের অধিকাংশ আরবী

মাকতাবাগুলোতে বইটি পাওয়া যায়।[৮] প্রকৃতপক্ষে গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে যে বইগুলোর কথা বলেছি আমি, সেগুলোর মধ্যে এ বইটি অতিমূল্যবান একটি বই। এ বইটির লেখক একজন আমেরিকান। লেখক বইটি রচনা করেছিলেন আমেরিকান সেনাবাহিনীকে গেরিলা যুদ্ধের রহস্য সম্পর্কে জানানোর উদ্দেশ্যে। যদিও আমেরিকা বিশ্বের অধিকাংশ গেরিলা যুদ্ধে পরাজিত হয়েছে। লেখক এ গবেষণাটি প্রস্তুত করেছেন যেন এ বিষয়টির গোপনভেদ বুঝা যায়। গেরিলা যুদ্ধের উপর তিনি ১৩টি গবেষণা পেশ করেছেন। যার মধ্যে ১০টি সফল। আর বাকী ৩টি বিফল। তিনি বিশেস্নষণ করে দেখিয়েছেন যে, কেন ১০টি সফল হয়েছে আর বাকী ৩টি কেন বিফল হয়েছে। ১০টির মাঝে সফলতার কী কারণ ছিল, আর বাকী ৩টি বিফল হওয়ার কারণ কী ছিল—এসব ব্যাখ্যা করেছেন।

[8] War of the flea : The classic study of guerrilla warfare| Av‡gwiKvb †jLK ievU© Zv‡ei 1965 m‡b eBwU iPbv K‡ib| cieZ©x‡Z gvngy` mvBwq` immvm eBwUi Aviex iƒcvšÍi K‡ib| eBwU cÖKvk K‡i‡Q Avj-Avivweq¨v dvD‡Ûkb| kvBL Avey gymAve Avm-myix dv. eBwUi e¨vL¨v K‡i‡Qb| 920 c„ôv K‡je‡ii شرح كتاب حرب المستضعفين bv‡g e¨vL¨vMÖš'wU B›Uvi‡b‡U cvIqv hvq| - Abyev`K|

লেখক বলেন, **"لا تقوم حرب العصابات إلا إذا توفرت أسباب نجاحها" - 'গেরিলা যুদ্ধ কেবল তখনই সংঘটিত হয় যখন তার সফল হওয়ার আসবাব বিদ্যমান থাকে|'**

'গেরিলা যুদ্ধ কেবল তখনই' কথাটা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আসবাব এমনিতেই তৈরি হয়ে যায় না| সে জন্য প্রস্তুতি প্রয়োজন হয়| প্রস্তুতি সম্প ন্ন হওয়া ছাড়া গেরিলা যুদ্ধ প্রত্যাখাত থাকবে| তাই যদি আপনি প্রস্তুতি ছাড়াই গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন করে দেন, তবে দেখবেন পুরো যুদ্ধটাই প্রতিপড়্গের ঘেরায় আটকে গেছে|

সব কিছুই আলস্নাহর হাতে, আলস্নাহ সব করার ড়্গমতা রাখেন| কিন্তু আমরা দারম্নল আসবাবে রয়েছি আর সে সম্প র্কেই কথা বলছি| আপনি যখন গেরিলা যুদ্ধে সফল হওয়ার আসবাব প্রস্তুত করতে পারবেন, তখন গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন করতে পারবেন| আপনি তখন গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন করতে পারবেন, যখন গেরিলা যুদ্ধের জন্য একটি সঠিক আদর্শ ও একটি গুরম্নত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু বিদ্যমান থাকবে; যার উপর ভিত্তি করে, যেটাকে কেন্দ্র করে মানুষজন একত্রিত হবে এবং যার জন্য মানুষ যুদ্ধ করবে| উদাহরণত সে আদর্শ ও কারণ দ্বীন হতে পারে বা দেশের

স্বাধীনতা হতে পারে অথবা মানুষের দারিদ্রতা দূর করা হতে পারে| যখন এমন একটি আদর্শ বা কারণের উপরে মানুষ একত্রিত হবে এবং যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হবে, তখন দেশের মধ্যে সরকার ও গেরিলা উভয় পক্ষের জন্য সমমানের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে| গেরিলা যুদ্ধের জন্য এমন মানুষদের প্রয়োজন পড়বে, যারা সক্ষমতার অধিকারী হবেন এবং কোরবানী করার জন্য দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হবেন| এতটুকু বিদ্যমান থাকলে গেরিলা ও রাষ্ট্রপক্ষের মাঝে শক্তির বিরাট পার্থক্য বিশেষ প্রভাবকর হবে না|

আপনি যদি পৃথিবীতে সংঘটিত গেরিলা যুদ্ধগুলোর দিকে দৃষ্টি দেন, তবে একটা আশ্চর্যকর বিষয় দেখতে পাবেন| সে গেরিলা যুদ্ধ হতে পারে ইসলামী অথবা ননইসলামী| আপনি দেখতে পাবেন, দরীদ্র অবরুদ্ধ জাতি তাদের সরকার ও শক্তিশালী পরাক্রমশালী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জয় লাভ করেছে, যদিও তাদের তেমন শক্তি-সামর্থ্য ছিল না| অবশ্য এটাও সত্য যে, গেরিলারা বাহিরের কোনো শক্তির সমর্থন পেয়ে থাকে কখনও কখনও| কিন্তু গেরিলাদের মাঝে (أن يكملوا المشوار) ...পরামর্শকারী ও যুদ্ধ পূর্ণতাদানকারী পরিতুষ্ট মানুষ না থাকলে বহিরাগত সে সাহায্য

কোনো কাজেই আসে না। তাই মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গেরিলা যুদ্ধের আসবাব প্রস্তুত থাকা।

গেরিলা যুদ্ধের ক্ষেত্রে আলস্নাহর নীতি হচ্ছে, গেরিলা বাহিনীকে কয়েকটা ব্যর্থ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থাৎ প্রথমে আপনি একটা গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন করবেন, সেটা ব্যর্থ হবে। প্রথম ব্যর্থতার পর যারা বেঁচে থাকবে, তারা পূর্ণতা বিধান করবে, নিজেদের মধ্যকার কিছু ত্রম্নটির সংশোধন করবে, ব্যর্থ হবে, আবার নিজেদের পূর্ণতা বিধান করবে। এভাবে শিখতে থাকবে, বিজয়ী হতে থাকবে।

প্রথম পয়েন্ট

জাতীকে পড়্গে আনা গেরিলা যুদ্ধে জয়ী হবার চাবিকাঠি

নোট পয়েন্ট: **‘গেরিলাদের বিজয়ের প্রধান সরঞ্জামগুলোর একটি হচ্ছে একটা জাতির বড় অংশে সরকারের প্রতি অসন্তোষ সৃষ্টি, তাদের মাঝে পরাধীনতার বোধ জাগানো, অস্থিরতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। এড়্গেত্রে (রাষ্ট্রপড়্গের) করণীয় হচ্ছে,**

অসন্তোষের এ পরিস্থিতিকে শান্ত করে দেওয়া। মানুষের মাঝে যেন এটা ক্রিয়া না করতে পারে সে ব্যবস্থা করা। জিহাদী গেরিলাদের বিরোধে থাকা রাষ্ট্রপক্ষের সফলতা নিহীত আছে জিহাদী গেরিলাদের গণমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাঝে। যেন গেরিলাদের শ্লোগান স্রেফ আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়। যেন গেরিলা বাহিনীর সদস্য ও তাদের সাহায্যকারী অল্পসংখ্যক মানুষই তাদের শ্লোগানে সন্তুষ্ট হয়। তাদের মাঝেই যেন তারা সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। তাহলে এটাই হবে তাদের পরাজয়ের সূচনা।'
আর আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

অর্থাৎ যদি অল্পসংখ্যক আদর্শবাদীতে গঠিত একটা গ্রুপই বীরত্ব ও সাহসিকতার চর্চা করে এবং তারা গণমানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে, গণমানুষকে তাদের আদর্শে সন্তুষ্ট ও অনুপ্রাণিত করতে না পারে, গণমানুষকে নিজদের গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাতে না পেরে ব্যর্থ হয়, তবে সে অঞ্চলে গেরিলা যোদ্ধাদের বিলুপ্তি নিকটে এসে যায়।

এটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট। এটা হচ্ছে মূল বিষয়। আর বাকীগুলো তার শাখা। আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করছি।

আমরা বলি, আমরা নিঃশেষ হয়ে গেলেও, আমাদের জীবন চলে গেলেও আমরা সত্যের উপর অটল থেকে যুদ্ধ করে যাবো শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত্ম। এ সত্যটার উপর আপনি সন্তুষ্ট, পরিতুষ্ট। আপনাকে এ সত্যটাকেই মানুষজনের মনের কথা বানাতে হবে। তাদের সম্মলিত সিদ্ধান্ত্মে পরিণত করতে হবে এটাকে।...

আপনি জাযিরাতুল আরবে দুশমনের দখলদারিত্বের ব্যাপারে নিশ্চিত, আপনাকে গণমানুষের বিরাট অংশকে বিশ্বাস করাতে হবে যে, জাযিরাতুল আরব দুশমনদের হাতে দখল হয়ে আছে। যখন আপনি নিশ্চিত ও পরিতুষ্ট যে, আলজেরিয়ায় গেরিলা যুদ্ধ হওয়া আবশ্যক; তবে আপনার জন্য অপরিহার্য হবে গণমানুষকে এ ব্যাপারে পরিতুষ্ট করা। অন্যথা আপনি অল্প কিছু সময়ের মাঝেই ব্যর্থ হয়ে যাবেন। আপনার আন্দোলন সামান্য কদিনের মাঝেই শেষ হয়ে যাবে। যেমনটা ঘটেছে শাইখ শহীদ মুস্ত্মাফা আবু ইয়ালা রহ.[৯] এর বেলায়। মানুষটি এক বিরাট

[9] kvBL Avey gymAve Avm-myix `vIqvZzj gyKvIqvgv MÖ‡š’i 6ô cwi‡”Q‡` D‡jøL K‡ib, Ôknx` gy¯Ídv Avey Bqvjv in. wQ‡jb GKRb gyRvwn`| wZwb Avj‡Rwiqvi 1954 mv‡ji we‡`ªv‡n Ask wb‡qwQ‡jb| 1963 mv‡j Avj‡Rwiqv‡K ¯^vaxbZv †`qv n‡j gy¯Ídv in. †`L‡jb †h, †mKz¨jvi, Kgy¨wb÷ I cyuwRev`xiv G‡ÿ‡Î Rqx n‡q †M‡Q| Avi Zviv GK kZvãx a‡i Pjgvb Avj‡Rwiqvb RvwZi msMÖv‡gi dmj wb‡R‡`i N‡i Zz‡j‡Q| ZvB gy¯Ídv in. bZzbfv‡e we‡`ªvn I wRnv` ïiæ Kivi wbwg‡Ë GKwU Av‡›`vjb M‡o Zzj‡jb| D‡Ïk¨, Avj‡Rwiqvq Avjøvni kixqZ‡K cÖwZwôZ Kiv| 1973 mv‡j Avj‡Rwiqvi ivóªcÖavb kvwhwj web Rvw`‡`i kvmbKv‡j gy¯Ídv in. Av‡›`vjb `uvo Kiv‡Z mÿg nb| Avwg Zvi

বীরত্বময় ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং চলে গিয়েছেন| অথচ তার অপরিহার্য করণীয়টা করেননি তিনি| তিনি এমন একদল মানুষ রেখে যেতে পারেননি যারা সবে মিলে সম্মানের পথের পথিক হয়ে একটি মাদারাসায় রূপ নিতো| আপনি লড়্যা করে দেখুন শাইখের এত পরিশ্রম তার লড়্যাগুলো বাস্ত্মবায়ন করতে পারেনি| প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায় তার কাজগুলো| কারণ তার সে আন্দোলন জনতাকে তার পেছনে সৈনিক হিসেবে দাঁড় করাতে পারেনি| পারেনি মানুষের বড় একটা অংশকে তার যুদ্ধের প্রতি সন্তুষ্ট ও পরিতুষ্ট করতে| তাই জাবহাতুল ইনকায যদি জিহাদ পরিচালনা করতো, এ দলের কাছে গণমানুষের সাপোর্ট ছিল, তারা আসবাবে পূর্ণ ছিল, তারা যদি জিহাদ পরিচালনা করতো তবে সফল হতে পারতো|

GKwU †iKW©K…Z eqv‡b ï‡bwQ, wZwb ivóªcÖavb‡K D‡Ïk¨ K‡i Av‡`k-wb‡la K‡i hv‡"Qb| hw` Avj‡Rwiqvq kwiqvn cÖwZôv bv Kiv nq, Z‡e ivóªcÖavb‡K wRnv‡`i ûgwK w`‡"Qb, fq †`Lv‡"Qb| Zvi GK eqv‡b Avwg ïbjvg wZwb wRnv`x gZv`‡k©i eY©bv w`‡"Qb, miKvix Av‡jg‡`i mZK© K‡i w`‡"Qb| wKš' Zvi G Av‡›`vjb †ewk w`b †U‡Kwb| KviY Avj‡Rwiqvq wKQz A¯¿ e¨emvqx‡`i mv‡_ mvÿv‡Zi mgq †Mv‡q›`vwefv‡Mi GKwU †Mvcb Avµg‡Y wZwb wbnZ nb 1976 mv‡j| Gici Zvi wKQz we‡kl mv_x knx` nb| Ab¨iv †MÖdZvi nb| Zv‡`i weiæ‡× wePvi P‡j, Zv‡`i †R‡j cy‡i †`qv nq|...1991 mv‡ji mvgwiK wecøe‡i c‡i Zvi wKQz QvÎ Zvi Av‡›`vjb‡K RxweZ Kivi †Póv Pvjvb miKv‡ii weiæ‡× wRnv` Pvjv‡bvi †Póv K‡ib MYZvwš¿K cš'vq|...G `jwU wefvwRZ nIqv I Zv‡`i Dci ZvKwdix‡`i †P‡c emvi Av‡M 1993 mv‡j RvgvAvZzj Bmjvwgqv Avj-gymvjøvni Gi mv‡_ GKxf~Z n‡q GKwU HK¨e× RvgvAv‡Zi Ask nb Zviv| mvg‡b G e¨vcv‡i Bw½Z Avm‡e BbkvAvjøvn|Õ

জাবহাতুল ইনকায বড় একদল মানুষের নেতৃত্বে ছিল| ২ কি ৩ মিলিয়নের মতো যুবক ছিল তাদের নেতৃত্বাধীন| আর এ জামাআতের প্রতি পরিতুষ্ট এ বিরাট একদল মুসলিমের প্রত্যেকেরই একটি করে পরিবার ছিল| অর্থাৎ যদি জাবহাতুল ইনকাযের সদস্যদের তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তবে সংখ্যাটা দাঁড়াবে ৩*৫=১৫ মিলিয়ন| একটি দেশে এতসংখ্যক মানুষ ছিল জাবহাতুল ইনকাযের নেতৃত্বে|

যদি জাবহাতুল ইনকায আলজেরিয়াতে জিহাদ করতো, তবে তাদের হাতে তাদের বিজয়ের প্রধান ও গুরম্নত্বপূর্ণ সরঞ্জামটি ছিল| কিন্তু এ জামাআতের মাঝে অন্য বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল না| সে সব বৈশিষ্ট্যাদির মধ্যে সবচে গুরম্নত্বপূর্ণ হচ্ছে, জাবহাতুল ইনকাযের নেতাদের সাহস ছিল না কারো উপর আক্রমণ করার| আমরা ইনশাআলস্নাহ আরেকটি মজলিসে আলজেরিয়া নিয়ে কথা বলবো| জাবহাতুল ইনকাযের কাছে গণমানুষের সমর্থনের শক্তিটি বিদ্যমান ছিল| কিন্তু আপনি অন্যদিকগুলোর কথা চিন্ত্মা করে দেখুন, তাদের মধ্যে ছিল না সেগুলো| তাই আপনি তখনই গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন করবেন যখন দেখবেন গেরিলা যুদ্ধের পূর্বশর্তগুলো পূরণ করা হয়েছে|

কখনও কখনও জনমত দোদুল্যমান থাকে| আপনি তাদের মাঝে এ বিষয়ের প্রতি পরিতুষ্টির আলামত দেখতে পাবেন| তাই আপনি যখন এ বিষয়ের প্রতি তাদের দোদুল্যমানতা কাটানো ও পরিতুষ্টি আনয়নের জন্য গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন করবেন, তখন দেখবেন আপনার যুদ্ধ শুরম্ন করাটাই জনমতের দোদুল্যমানতা কাটিয়ে দেবে এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রতি তাদের পূর্ণ পরিতুষ্টি এনে দেবে পূর্ণমাত্রায়|

গেরিলা যুদ্ধের নেতাদের এ বিষয়ে বিজ্ঞ ও বিচড়্গণ হতে হবে| উদাহরণত দেখুন জর্দানের যুদ্ধের সময় পুরো জাতি সৈনিক বেশে প্রস্তুত ছিল জিহাদের জন্য| কিন্তু জিহাদী আন্দোলনের নেতাগণ সে পরিমাণ প্রস্তুত ছিলেন না| আমি এখানে জর্দানের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কথা বলছি না| কারণ তারা তো সরকারেরই একটা অংশ ছিল| আমি বলছি জিহাদী আন্দোলনের লোকদের কথা| তারা ছিল শান্তশ্ন ও সহনশীল| তাদের কাছে প্রধান সরঞ্জামটা ছিল| কিন্তু তারা সরকারের মুখোমুখী হতে চাইল না| তারা চাইছিল না ইখওয়ানের মুখোমুখী হতে| চাইছিল না পরিস্থিতিকে সঠিক বেগে প্রবাহিত করতে| এভাবে তারা সুযোগটা হাতছাড়া করে ফেলল|

জাতীকে সৈন্যরূপে প্রস্তুত করা ও বিজয় সুনিশ্চিত করার ড়্গেত্রে গেরিলা বাহিনীর নেতৃত্বদানকারীদের ভূমিকা প্রসঙ্গে

গেরিলা বাহিনীর নেতাদের উচিত জনগণের পরিতুষ্টি ও তাদের নিকটবর্তীতা তলিয়ে দেখা, পরীড়্গা করে দেখা| মানুষের মাঝে যদি তারা এমন দোদুল্যমানতা দেখে, যে দোদুল্যমানতা গেরিলা যুদ্ধ শুরম্ন করলে কেটে যাবে এবং সঠিক পরিমাণে গণমানুষের পরিতুষ্টি পাওয়া যাবে, তবে তাদের শুরম্ন করতে হবে এবং গণমানুষের পূর্ণপরিতুষ্টির জন্য অপেড়্গা করবে না তারা| সবসময় এমন অপেড়্গা করা আবশ্যক হয় না| গেরিলা যুদ্ধের আসবাবগুলো না থাকলেও, কখনও কখনও যুদ্ধ শুরম্ন করে দিলেই আসবাব প্রস্তুত হয়ে যায়| তাই এমন অবস্থা হলে আসবাব প্রস্তুতের জন্য অপেড়্গা করবেন না আপনি| বিশেষ করে জিহাদের ড়্গেত্রে আপনি আলস্নাহর মুখাপেড়্গী হবেন, আলস্নাহর নির্ধারণ ও তাওফীকের উপর নির্ভর করবেন|

ইরানে রাফেজীদের বিদ্রোহের সময়টা| নিকৃষ্ট খোমেনীর নেয়া সবচে গুরম্নত্বপূর্ণ সিদ্ধান্থটি ছিল ‘ইরানে আসার সঠিক সময় নির্ধারণ করতে পারা’| তার এ সিদ্ধান্থটাই ইরানে তাদের

শক্তির পালস্না উল্টে দেয়| তার আসার আগে ইরানে তাদের ও বিপড়্গের শক্তি বরাবর সমান ছিল| কিন্তু তার আসার পরড়্গণেই ইরানে শক্তির পালস্না পাল্টে গেল| খোমিনীর নিজের তুলনায় তার এ সিদ্ধান্ত্মটা ছিল অধিক বিপজ্জনক| এমনকি এ নিয়ে হুকমিও দেয় শাহবুর বখতিয়ার[১০] -যাকে এর কিছু দিন পরই ইরানীরা জবাই করে- বখতিয়ার বলেছিল, *'খোমিনী যদি ইরানে একটি বিপস্নবের নেতা হয়ে আসে, তবে আমি তাকে গ্রেফতার করবো| আর যদি একজন ধর্মীয় নেতা হিসেবে আসে, তবে আমি তাকে স্বাগত জানাবো|'*

এরপর খোমিনী ইরানে একজন বিপস্নবী নেতা হিসেবে আসার জন্য তোড়জোড় শুরম্ন করেন সঠিক সময়টার জন্য| সঠিক সময়ে ইরানে আসলেন খোমিনী| তার আসার পরেই ইরানে ড়্গমতার পালস্না পাল্টে গেল|

এখান থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, বিপস্নব-বিদ্রোহের ড়্গেত্রে নেতাদের ও আলেমদের ভূমিকা বেশ

---

[10] kveyi eLwZqvi| 26 Ryb 1915 - 6 AvM÷ 1991| Biv‡bi kvn gynv¤§v` †iRv evnjwei ûKzg Aax‡bi me©‡kl cÖavbgš¿x| Bivbx wecø‡ei ci wZwb c¨vwim P‡j hvb| †mLv‡bB wZwb g„Zz¨ ch©šÍ Ae¯'vb K‡ib| 1991 mv‡j GK ¸ßnZ¨vq wbnZ nb wZwb|

গুরুত্বপূর্ণ। আরেকটু যোগ করি, কেউ যদি এসব কাফেরদের জীবনী পড়ে, তাদের ইতিহাস, তাদের আদর্শের জন্য তাদের লড়াইয়ের কথাগুলো পড়ে; এরপর বর্তমান মুসলিম আলেমদের পরাজিত ও হতাশায় পর্যবসিত অবস্থার দিকে তাকায় তবে সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতে বাধ্য। আমি যখন খোমিনীর ওসিয়ত পড়লাম, তার বীরত্বের ঘটনাগুলো জানলাম; তখন আমি একেবারে অস্থির হয়ে গেলাম, বেশ অস্বস্তি অনুভব করলাম। এমনকি আমি পড়াটাও পূর্ণ করতে পারলাম না তার বীরত্ব, সাহস ও অদ্ভুত ঘটনাগুলো পড়ে এতটাই অস্বস্তিতে ভুগেছিলাম তখন।

গেরিলা যুদ্ধ সামনে অগ্রসর ও অব্যাহত থাকার কারণ

নোট পয়েন্ট: **'গেরিলা জিহাদী যুদ্ধ অগ্রসর করার পরিবেশ স্বংক্রিয়ভাবে একের পর এক তৈরি হয়ে যায়। আর এ পরিবেশ তৈরি হয় জাতির উপর ব্যাপকভাবে ধ্বংসের পরিস্থিতি আপতিত হলে। ব্যাপক আকারে গণমানুষের লালিত আদর্শকে লঙ্ঘন ও অপমানিত করা হলে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে দ্বীনি আদর্শ বা দেশপ্রেমের আদর্শ অথবা গোত্রভিত্তিক আদর্শ। একইভাবে যখন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ধ্বংসের মুখে**

পড়ে, দারিদ্র্যতা ও কপর্দকহীনতার পরিস্থিতি ছড়িয়ে পড়ে। সাথে সাথে মানুষ যখন নিজদের নির্যাতিত মনে করে, যখন মনে করে তাদের সম্মান ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, এভাবে অন্য কিছু দিক যখন একটা বড় আকার ধারণ করে তখন স্থানীয় জালেম সরকার বা বৈদেশিক দখলদার শক্তির বিরূদ্ধে যুদ্ধের পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়।’

অর্থাৎ যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমেই থাকবে দ্বীনি কারণ। এরপর থাকবে দেশগত, গোত্রগত ও অর্থনৈতিক কারণ। উদাহরণত, লক্ষ্য করুন, কুর্দীদের অনুভূতি হচ্ছে তারা নির্যাতিত-বঞ্চিত। এটা কুর্দী জাতীর অনুভূতিতে রূপ নিয়েছে। কুর্দী চাই সে তুরস্কের হোক, ইরাকের বা অন্য কোনো অঞ্চলের হোক সকল কুর্দীই নিজেদের নির্যাতিত ও বঞ্চিত মনে করে। এ জাতীগত অনুভূতিটা তাদের মাঝে কাজ করে। তেমনি আপনি দেখবেন কম্যুনিস্টরাও নিজদের বঞ্চিত মনে করে। তেমনি মুসলিমরাও নিজদের নির্যাতিত ও বঞ্চিত মনে করে। প্রত্যেকের ভেতরেই এ প্রক্রিয়াটি কাজ করে। এমনকি আপনি কুর্দী ইসলামী আন্দোলনের মাঝেও এমন একটা অনুভূতি পাবেন যে, তারা নিজদের কুর্দীজাতিগত দিক থেকে বঞ্চিত ও নির্যাতিত মনে করে। অর্থাৎ যদি আপনি এ অনুভূতিটাকে দ্বীনি পদ্ধতিতে

কাজে লাগলেন তাহলে তা শরয়ী রূপ ধারণ করবে। কিন্তু প্রচলিতভাবেই বঞ্চনা ও নির্যাতনের এ অনুভূতি এক দল মানুষকে অনায়াসে প্রতিরোধের দিকে ধাবিত করে। আপনি এ বিষয়টি অল্প কিছু মানুষের মাঝে পরখ করে দেখলেও তাদের অধিকাংশের মাঝেও এটি পাবেন।

বর্তমানে যুগোশস্নাভিয়ার পুরোটাতে যুদ্ধ চলছে। সেখানকার এ যুদ্ধ পুরোটাই বর্ণবাদের উপরে আধারিত। ক্রোয়েশিয়ার মানুষজন যখন দেখলো যে, ফেডারেল সরকারের অধীনে হওয়ার কারণে তারা নির্যাতিত-বঞ্চিত, তখন তারা নিজদের স্বাধীনতা দাবি করলো, পরাধীনতা থেকে মুক্তি চাইলো।

সাধারণত গেরিলা যুদ্ধের ড়্গেত্র প্রস্তুত হওয়া এবং তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কারণ হিসেবে দ্বীনি ও বিশ্বাসগত দিকটিই অধিক শক্তিশালী। এরপরই আসে দেশগত, গোত্রগত ও অর্থনীতিক দিকগুলোর কথা।

গেরিলা পড়্গ ও জাতীকে যুদ্ধে শামিলকরণ

নোট পয়েন্ট: **‘গেরিলা জিহাদীদের নেতৃবৃন্দ বিদ্যমান যুদ্ধে পুরো জাতিকে শামিল করার ড়্গেত্রে ভূমিকা রাখবে। জাতির শামিল**

হওয়া আলস্নাহ চাহে তো যুদ্ধের ফলাফলের ড়্গেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। নেতৃবৃন্দের উপর সামরিক, মিডিয়াগত ও সংগঠনগত কৌশলগুলো ধারাবাহিক প্রয়োগ করা আবশ্যক; যাতে করে এ যুদ্ধটা পুরো জাতির সকল মানুষের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।’

নেতৃবৃন্দের উপর বর্তায় এ দায়িত্ব। বীরত্বপূর্ণ অপারেশনগুলো আমরা আঞ্জাম দেবো। এড়্গেত্রে সাধারণ মানুষদের রাখা আমাদের জন্য আবশ্যক নয়। বরং আপনাকে মানুষদের পরিতুষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে এবং নিজের এ ব্যাপারটা তাদের সকলের ব্যাপার বানিয়ে দিতে হবে। সিরিয়ার জিহাদে এ বিষয়টা যথেষ্ট আকারে প্রয়োগ করা হয়নি। মুজাহিদরা জিহাদী অপারেশনের প্রতি গুরম্নত্বারোপ করতেন। কিন্তু মিডিয়াগত কার্যক্রমে তেমন মনোযোগ দিতেন না। ‘আমরা তোমাদের পড়্গে লড়ছি’ এমন জনমত তৈরি করতে বিভিন্ন প্রকাশনা প্রকাশ বা মানুষের সাথে যোগসূত্র রড়্গা করা ও মসজিদে খুতবায় বলার মতো মিডিয়াগত কাজ হতো না। একটা বিরাট সীমা পর্যন্ত্ম ইসলামী শরীয়ত বিষয়বস্তু থেকে অনেক দূরে ছিল। এ যুদ্ধের কারণ বুঝার ড়্গেত্রে অবহেলিত ছিল ইসলামী শরীয়ত। তাই যখন মানুষ প্রথম বিড়্গোভে বেরোয়, তখন একদিনের ভেতরে

২৫০/২২০ জন নিহত হলে মানুষ থেমে যায়, আর বেরোয় না দ্বিতীয় কোনো বিক্ষোভে।

একইসময়ে আপনি ইরানের দিকে লক্ষ্য করুন। আপনি দেখতে পাবেন, একটা বিক্ষোভে ২০ জন নিহত হয়েছে, এরপর ২০ নিহতকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে মানুষ বেরিয়েছে। এবার ২০০ জন নিহত হল। এরপর এ ২০০জনকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে মানুষ বের হল। এভাবে চলতে থাকলো। একবার এরকমই জুমআর নামাজের পরে কয়েকশ নিহতকে বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এলে রাষ্ট্রীয় সৈন্যরা তাদের উপর গুলি বৃষ্টি বর্ষণ করে এবং প্রায় ১৫ হাজার মানুষ মারা যায়। এ দিনকে তারা কালো শুক্রবার বলে। এবং এদিনকে ঈদের মতো পালন করে। চিন্তা করে দেখুন, বিক্ষোভের উপর জনতার এ অটলতার কারণ হচ্ছে, মানুষ নিশ্চিত বিশ্বাস করতো যে, এ আন্দোলন তাদেরই একটা অংশ এবং এ আন্দোলন তাদেরই প্রতিনিধিত্ব করে।

এ বিষয়ে জোর দিয়ে বলছি, জিহাদী জামাআতগুলোকে মতাদর্শগত মূলনীতিগুলোকে যথেষ্ট মনে করলে চলবে না। মতাদর্শগত মূলনীতিগুলো বিস্তারিত আকারে সাধারণ মানুষের জন্য বুঝা কঠিন হবে।

আর আমরা হলাম একটা ইসলামী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ অংশের মতো। আমরা কিছু মূলনীতিতে সন্তুষ্ট হতে পারি। যেগুলো কখনও কখনও বুঝা কঠিন হয়ে থাকে সাধারণ মানুষের জন্য। যেমন হাকিমিয়্যাত ও সালাফদের ব্যাপারটা। তাই আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে, আমরা আমাদের ব্যাপারটা সাধারণ মানুষকে বুঝানোর জন্য যুদ্ধের কারণগুলোর সারসংক্ষেপ করে নেবো। প্রথমে আসবে দ্বীনি কারণগুলো। এরপর আসবে একে একে অঞ্চলভিত্তিক কারণ। এরপর আসবে অনুভূতিপ্রবণ কারণগুলো। আপনি সাধারণ মানুষকে ‘চলো, আমি তোমাকে হাকিমিয়্যার আলোচনাটা বুঝিয়ে দিই’ বলার পরিবর্তে তার সামনে ‘পতিতাবৃত্তি, অশ্লীলতা ও অন্যান্য বিষয়ের ক্ষতিগ্রস্থতা নিয়ে’ আলোচনা করবেন। এটা তাদের জাগ্রত হতে সাহায্য করবে। আর কঠিন বিষয়গুলো ইসলামী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠাংশকে বুঝতে হবে। আর মানুষের অন্তরে সে দরজাটা তৈরি করতে হবে, যার মাধ্যমে তাদের ভেতরে মাসআলাটি প্রবেশ করানো যায়।

মাছের জন্য সাগর যেমন, গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য জনগণ তেমন

গেরিলা যুদ্ধের বড় মাপের একজন বিশেষজ্ঞ -সম্ভবত মাউ সে তুং-[১১] এ মালউন, শহীদ আব্দুল কারীম খাত্তাবী রহ.[১২] কে নিজের একজন শিক্ষক হিসেবে মানতো| সে বলে, ‘মাছের জন্য সাগর যেমন, গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য জনগণ তেমন|’ অর্থাৎ মাছ যে পরিবেশে বেঁচে থাকতে সক্ষম, সে পরিবেশটা হচ্ছে সাগর| আর জনগণ গেরিলা যোদ্ধাদের জন্য সেরকমই কাজ দেয়| কারণ জনগণই হচ্ছে যোদ্ধা, অর্থ ও তথ্যের উৎস|

যুদ্ধের সময় যারা শহীদ হবেন, তাদের রিপেস্নসমেইন্ট আমরা কোথা থেকে পাবো? কোথা থেকে আসবে গেরিলাদের খাবার ও পানীয়? এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার সময় কারা

---

[11] Pxbv Kgy¨wb÷ `‡ji †bZv| Rvcvwb `Lj`vi I RvZxqZvev`x‡`i weiæ‡× j¤^v mgq a‡i †Mwijv hy× cwiPvjbv K‡i gvI †m Zzs| 1949 mv‡j People’s Republic of China Z_v MYcÖRvZš¿x Pxb cÖwZôvi ga¨ w`‡q gvI †m Zzs‡qi Av‡›`vjb †kl nq| gvI †m Zzs g‡iv‡°i gyRvwn` Avãyj Kixg LvËvex in. †K wb‡Ri ¸iæ gv‡bb, Zuvi KvQ †_‡K DcKvi MÖnY K‡ib|

[12] gynv¤§v` web Avãyj Kvixg LvËvex (1882-1963)| g‡iv‡°vi GKRb mvgwiK †bZv| g‡iv‡°i Dci Dcwb‡ekev`x †¯úb I d«v‡Ýi weiæ‡× wiwdqvb cÖwZ‡iv‡ai GKRb †bZv wQ‡jb wZwb| wZwb wicvewjK Ae wid-Gi cÖwZôvZv| 1921-1926 ch©šÍ G †`‡ki cÖavb wQ‡jb wZwb|

গেরিলাদের সাহায্য করবে, গেরিলাদের আড়াল দেবে? আপনার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের উৎস কী হবে? এসব প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে জনগণ।

মানুষ যখন আপনার প্রতি পরিতুষ্ট হবে, আপনার সমর্থক হবে। তখন তারা সে সব তথ্য এনে দেবে, যা আপনি রাষ্ট্রপড়্োর ব্যাপারে জানতে চান। সিরিয়ার জিহাদে সাধারণ মানুষরা যখন কোনো গোয়েন্দা সম্পর্কে জানতে পারতেন, তখন খবর ছড়িয়ে দিতেন যে, অমুক মহলস্নায় একজন গোয়েন্দা আছে। এমনকি কখনও কখনও মানুষজন মসজিদে মসজিদে দেয়ালের উপর সে সব লোকের নাম লিখে দিতেন যাদের তারা গোয়েন্দা বলে সন্দেহ করেন। মানুষজন মুজাহিদদের দৃষ্টি এসব গোয়েন্দাদের দিকে আকৃষ্ট করতেন, যদিও এসব গোয়েন্দাদের কাছে কোনো খবর থাকতো না।

এ পয়েন্টে আমি কিছু কথা আরো যোগ করবো। কারণ এটি একটি গুরম্নত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আপনাকে বুঝতে হবে কেন গণমানুষকে যুদ্ধের মাঝে প্রবেশ করানো জরম্নরী। আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে, গণমানুষকে পরিতুষ্ট করতে পারাই

বিজয়ের প্রথম শর্ত| আমজনতা যদি আপনার সাথে থাকে, তবে বিজয় আপনার|

একটি উদাহরণ দিচ্ছি| এখানে আফগানিস্থানে যখন মানুষ জিহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হয়, তখন যুদ্ধ বেশ জোরেশোরে চলতে থাকে| প্রথম সময়ে শাসকের বিরূদ্ধে কৃত জিহাদের প্রতি না মানুষ পরিতুষ্ট ছিল| না পরিতুষ্ট ছিল মওলবিগণ, গোত্রগুলো এবং ইসলামী আন্দোলন| এরপর যখন কম্যুনিস্ট বিপস্নব সংঘটিত হয় প্রথমবার, এরপর দ্বিতীয়বার, তখনও মানুষ জিহাদের সমর্থক হয়ে উঠেনি| কিন্তু যখনই সোভিয়েত আফগানিস্থানে প্রবেশ করলো, তখন সবার কাছে আসল বিষয়টা স্প ষ্ট হল এবং সকল মানুষ জিহাদের সমর্থক হলো, যুদ্ধে অংশ নিল|

আপনি আপনার দেশের একজন| আপনার জাতির মন-মানসিকতা বুঝতে হবে আপনাকে| কোন কোন কাজ, কী কী কৌশল আপনার দেশে প্রয়োগ করলে আপনার জাতির একটা বড় অংশকে জাগাতে পারবেন, সেগুলো আপনাকে বুঝতে হবে, জানতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে|

মিসর বা জর্দানের উদাহরণ নিন। আপনি যদি সাধারণ মানুষকে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, জর্দান-মিসরের শাসক কাফের। আপনি এটা করতে সক্ষম হবেন না। এ ব্যাপারে মানুষের সমর্থন পাবেন না। কারণ সে দেশের মানুষ প্রতিদিন টেলিভিশনের পর্দায় শাসককে নামাজরত দেখে। দেখে যে, আলেমরা তার পক্ষে কথা বলছে। আলেমরা বলছে যে, এ শাসক শরীয়তের কোনো কিছুই পরিবর্তন করেনি, শরীয়ত বিরোধী কোনো আইন করেনি।

আপনাকে মেধা দিয়ে খেলতে হবে। মেধা খাটিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল সাজাতে হবে। জনগণকে কাছে টানার জন্য আপনি সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি কৌশলের পথ ত্যাগ করে পরোক্ষ আঘাত হানবেন। আপনি প্রথমে ইহুদি অথবা আমেরিকানদের কোনো স্বার্থের উপর আঘাত হানবেন। তখন একটা রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবেই তার বিদেশী নাগরিকদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। তখন রাষ্ট্রপক্ষ আপনার উপর আঘাত হানবে, আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। এভাবে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আপনি 'হাকিমিয়া কী আপনি তা জানেন?' বলে চাপোষা মানুষকে যদি আপনি হাকিমিয়া বুঝাতে যান, তবে সে আপনার কথাও বুঝবে না আর আপনার পক্ষেও আসবে না।

বরং যখন আপনি ইহুদীদের স্বার্থে আঘাত হানবেন। তখন রাষ্ট্রপক্ষ আপনার উপর আঘাত করবে, আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তখন এসে সাধারণ মানুষ বলবে, 'দেখো *বাচ্চাগুলা শাইখদের উপর আঘাত করছে, মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে ইহুদীদের পক্ষ হয়ে! এরাও ইহুদীদের মতো কাফের।'

সাধারণ মানুষকে সাধারণ পদ্ধতিতে বুঝাতে হবে, সমর্থনে আনতে হবে। আপনি যখন উপরের কৌশলটা প্রয়োগ করবেন, তখন আপনি মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হবেন যে, 'আপনি ইসলামের পক্ষ হয়ে লড়ছেন।' তাই এক্ষেত্রে সরকারকে জটিলতা ফেলতে হবে। আপনি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবেন না। বরং কার্যতভাবে আপনি নিজের পক্ষ থেকে এ চালটা চেলে দেবেন, এ কৌশলটা প্রয়োগ করবেন। মিসরের জিহাদী তানজীম এটা জানেন ভাল করেই। এমনকি গোয়েন্দাসংস্থাও এ বিষয়টা জানে। গোয়েন্দারা জানে যে, জিহাদীরা এভাবে চিন্তা করে থাকে। আর এ কৌশলটা অধিকাংশ আরব দেশে এবং অধিকাংশ মুসলিম দেশে সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব।

উপযুক্ত সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

তবে আপনাকে এটাও জানতে হবে যে, প্রতিটি মূলনীতি একটা সময়ের সাথে নির্দিষ্ট থাকে| একটা সময় পর্যন্ত কাজ করে| তাই আমরা যে কোনো ময়দানে কৌশল প্রয়োগের বিষয়ে সে ময়দানের নেতৃত্বের উপর নির্ভর করবো| ময়দানী নেতৃত্ব যুদ্ধের মাঝেই তাদের সময়টা অতিবাহিত করেন| তারা পরিস্থিতি বিবেচনা করে বুঝতে পারবেন এখন অমুক কৌশলটা প্রয়োগ করার সময়| আবার যখন অন্য পরিস্থিতি সামনে আসবে, তখন তারা ময়দানী হওয়ার কারণে বুঝতে পারবেন যে, এখন অমুক কৌশল প্রয়োগের সময়| কিন্তু যখন নেতৃত্ব দুনিয়ার শেষ প্রান্তে, সীমান্তের ওপারে অথবা অন্য কোনো দেশে অবস্থান করে এবং রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে বিদ্রোহ পরিচালনা করে - যেমনটা জিহাদের অনেক পরিচালনার ক্ষেত্রে ঘটেছে এখানে-! দূরদেশে বসে সঠিক সময়ে সঠিক করণীয় সম্পর্কে বুঝে যুদ্ধের পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়| মোটকথা, একটা অঞ্চলের জিহাদী নেতৃত্ব সঠিকভাবে জানবেন যে, কোন কৌশলে জনগনের সমর্থন আদায় করা যায়|

আলজেরিয়ায় আব্বাস মাদানী ও আলী বিন হাজ একটা সময়ে সুযোগ পেয়েছিল| যদিও সে সুযোগ হারাম পন্থায় পেয়েছিল তারা| তারা মানুষকে বুঝাতে সক্ষম হয় যে, অচিরেই তারা সরকারের সাথে শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করবে| তারা নির্বাচনসহ অন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় আগায়| অবশেষে সমস্যা সৃষ্টি হল যখন রাষ্ট্রপক্ষ গণতান্ত্রিক নিয়ম ভেঙে ফেলে এবং গণতান্ত্রিক নিয়ম অস্বীকার করে| এভাবে ৪-৫ দিন এমন পরিস্থিতি বিরাজমান থাকে যে, যে সব মানুষজন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিতুষ্ট ছিল তারা জিহাদের ঘোষণার মাধ্যমে একটি ইসলামী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল| কারণ মানুষের মনে এটা ছিল যে, তারা এ জামাআতের সাথে শেষ পর্যন্ত যাবে| কিন্তু জামাআতের নেতৃবৃন্দ এ সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলে|

আমি ধারণা করেছিলাম, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাবহাতুল ইনকাযের যাওয়ার একটা কৌশল ছিল| এমনকি শেষ সময়টা পর্যন্ত আমি আশা করেছিলাম যে, জাবহাতুল ইনকাযের মাঝে কিছুটা কল্যাণ হলেও আছে| আশা ছিল, তারা কোনো কৌশল অনুসরণ করছে| কারণ আলজেরিয়ান জাতি পশ্চিমা, ফ্রান্স ও গণতন্ত্রের সাথে অনেক দিনের সংস্পর্শে ছিল| সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের ভেতরে বিরাট পরিমাণে এসব

জেঁকে বসেছিল| যদিও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গ্রহণের কৌশলটা না-জায়েজ| কারণ এ নিয়ে অনেক ইখতেলাফ, ব্যাখ্যা, আকীদার বিবিধ আলোচনা ও নানান বিষয় আছে|

সিদ্ধান্ত| উপযুক্ত সময় এলে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ শুরু করার সিদ্ধান্ত কয়েক দিনের ভেতরে নিতে হয়| অন্যথা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়| কল্পনা করে দেখুন, যদি জাযিরাতুল আরবের কোনো আলেম যুদ্ধ শুরু হবার আগেই দার্শনিক সেজে মানুষদের পরিতুষ্ট করতে চায়, মানুষদের সমর্থন এ বলে অর্জন করতে চাই যে, সাউদিরা আমরিকীদের অনুগত হয়ে গেছে| তবে কাউকেই পরিতুষ্ট করতে পারবে না, নিজের সমর্থনে আনতে পারবে না মানুষদের| কিন্তু শাইখ সফর আল-হাওয়ালী যখন সঠিক ও উপযুক্ত সময়ে কথা বলেছেন, তখন তিনি সক্ষম ছিলেন মানুষের মধ্যকার একটা বিরাট অংশকে সমর্থনে আনতে| কিন্তু তিনি অর্ধেক পথেই থেমে গেলেন| এ দায়িত্বটা পূর্ণ করার ছিল| এটা বলা দরকার ছিল যে, যদি এরকম হয়ে থাকে, তবে বিষয়টা এমন এমন|

ইরাকে সেনা নামানোর সময়টা গেল| ন্যাটো জোট ইরাকীদের উপর বিজয়ী হল| সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপিত

মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ভিনদেশী সৈন্যদের ইরাকে অবস্থান করার প্রয়োজনও পুরিয়ে গেল। 'তোমরা এসেছো ইরাককে মারতে। এখন তো ইরাককে মারার কাজ শেষ। তোমরা এসেছিলে কুয়েত স্বাধীন করতে। এখন তো কুয়েত স্বাধীন হয়েছে। সমস্যা মিটে গেল। এখন তোমরা যাও।' সে সময় সুযোগটা কাজে লাগানো অপরিহার্য ছিল এবং বলার দরকার ছিল যে, 'তোমরা যা করতে এসেছো, তা করেছো। এবার নিজদের সেনা নিয়ে কেটে পড়ো। যদি নাইবা যাও, তবে এটা তো তোমাদের দখলদারিত্ব হিসেবে গণ্য হবে।'

যার হাতে মানুষের অন্তরে প্রবেশের চাবি রয়েছে, তার হাতেই যুদ্ধ জয়ের চাবি রয়েছে। গেরিলা যুদ্ধ করার অর্থ কেবল সামরিক যুদ্ধ নয়, যেমনটা আপনি মনে করছেন। বরং এখানে মনস্তাত্ত্বিকতার একটা বিরাট ময়দান রয়েছে।

এখানে আফগানে যুবকদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকতা? গত রাতে এক ভাই আমাকে বললেন, 'তাদের উঠা-বসা পাহাড়ের সাথে, অস্ত্র-শস্ত্রের সাথে। তারা এদিক দিয়ে বিজয়ী। কিন্তু তাদের মস্তিষ্ক পরিপক্ক করার কাজটি অধরাই থেকে যাচ্ছে।'

বাস্তব কথা। আমি লক্ষ্য করেছি, মুজাহিদ ভাইদের মাঝে রাজনৈতিক তথ্যাদি ও সংবাদের পেছনের সংবাদ বের করার ক্ষেত্রে কমতি রয়েছে। মনে হয় না, প্রতি দশজন মুজাহিদের মাঝে একজনও রেডিও, সংবাদ বিশ্লেষণ অথবা খবর শোনা কিংবা নিয়মিত বিভিন্ন পত্রিকা পড়েন। এমনকি অনেক ভাইকে আপনি দেখবেন এমন যে, তারা বিভিন্ন প্রকাশনার কেবল শিরোনাম পড়ে যান। যে শিরোনামটা আকর্ষক হয়, কেবল সেটাই পুরো পড়েন এরপর আবার সে প্রকাশনাটা রেখে দেন।

তাই গেরিলা বাহিনীর প্রতিজন সদস্য বিশেষ করে নেতৃত্ব পর্যায়ের লোকদের জন্য আবশ্যক হচ্ছে এ সংস্কৃতি যাকে আমরা রাজনীতি/আন্দোলন/বাস্তবজ্ঞান বলি, সেটা অর্জন করা। তবে প্রতিটি সৈন্যের জন্যই এটা একই হারে আবশ্যক নয়। বরং নেতৃত্ব পর্যায়ের যোদ্ধা, মুজাহিদ নেতাদের, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সৈনিক এবং নেতা হবার উপযুক্ত যারা, তাদের জন্য এটা আবশ্যক। কারণ গেরিলা যুদ্ধের বিষয়টাই এমন যে, এর নেতারা একজন একজন করে হারিয়ে যাবেন, শহীদ হবেন। নেতা থাকবেন সামনের সারিতে যুদ্ধের নেতৃত্বে এরপর তিনি শহীদ হলে দ্বিতীয় আরেকজন নেতা হবেন। এভাবে চলতে থাকবে। তাই নেতৃত্ব দেবার যোগ্য একটা শ্রেণী প্রস্তুত করতে

হবে। যারা বাস্তবতার জ্ঞান সম্পন্ন হবেন। মূলকথা হচ্ছে, নেতৃত্ব পর্যায়ের লোকেরা কেবল বীরত্বে সজ্জিত হলেই চলবে না, যারা কেবল সামরিক যুদ্ধই পরিচালনা করবেন। বরং নেতৃত্ব শ্রেণীর মানুষদের সচেতন ও বাস্তবতার জ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে।

مفتاح الصراع : যুদ্ধের চাবি

আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি 'যুদ্ধের চাবি'র আলোচনায়। যুদ্ধের চাবি হচ্ছে সে চাবি যা দিয়ে মানুষের মনের দরজা খুলে গেরিলারা প্রবেশ করে সাধারণ মানুষদের যুদ্ধের সমর্থক বানাবে, গেরিলা যুদ্ধ ও গেরিলা বাহিনীর প্রতি তাদের পরিতুষ্ট করবে।

উদাহরণত, জাযিরাতুল আরবে গেরিলা যুদ্ধের চাবি হচ্ছে, আরবে খ্রিস্টান-ইহুদী সৈন্যদের উপস্থিতিকে কাজে লাগানো। মিসরে গেরিলা যুদ্ধের চাবি হচ্ছে, মিসরের সরকারকে ইহুদী-খ্রিস্টানদের গোলাম প্রমাণ করা। জর্দান ও ফিলিস্তিনে গেরিলা যুদ্ধের চাবি হচ্ছে, ইহুদী ও ইহুদীদের লাগাতার হিংস্র কার্যক্রম। সিরিয়া ও লেবাননে গেরিলা যুদ্ধের চাবি হচ্ছে, নুসাইরি শিয়াদের শাসক হওয়া। এভাবে অন্যান্য দেশেও এটার প্রয়োগ হবে। আপনি যে দেশের মানুষ, সে দেশের ব্যাপারে আপনার

জানাশুনা থাকবে। সে অনুযায়ী আপনি আপনার কৌশলটা সাজাবেন। আপনি আপনার অঞ্চলের পরিস্থিতি অনুযায়ী গেরিলা যুদ্ধের চাবিকাঠি প্রয়োগ করবেন এবং সেটাকে সামনে রেখে যুদ্ধ শুরম্ন করবেন।

আমাদের মূলনীতি হবে, গেরিলা যোদ্ধাদের শ্রেষ্ঠাংশকে অবশ্যই আদর্শের বিষয়গুলো পুরোপুরি বোঝাবো আমরা। হাকিমিয়া, দ্বীনসহ সে সব বিষয় বুঝিয়ে দেবো, যেগুলো লড়াই চালিয়ে যাওয়ার মূলভিত্তি হবে। কিন্তু সাদাসিধে মানুষের ড়্গেত্রে তাদের উপযুক্ত করে বুঝাতে হবে তাদের। দ্বীন, ইলম, বুঝ ও সংস্কৃতির দিক থেকে মানুষ বিবিধ স্থরের হবে। তাই একদল মানুষ গড়ে তুলতে হবে মূলগত আদর্শের উপর। আর একদল মানুষ গড়ে তুলতে হবে শ্রেষ্ঠাংশ হিসেবে। এমনকি সাদাসিধে দরিদ্র মানুষটিকে বুঝাতে হবে এবং পরিতুষ্ট করতে হবে এ বলে যে, যদি সে যুদ্ধ করে তবে বিজয়ের পর তার জীবনটা সুন্দর হয়ে উঠবে, পরিপাটি হয়ে উঠবে। এটা তো সত্য যে, আলস্নাহর রাহে যুদ্ধ করে সে সাওয়াব পাবে এবং শহীদ হলে জান্নাতে যাবে। কিন্তু তাকে জীবনের সুন্দর পরিবর্তনের বিষয়টিও বুঝাতে হবে।

একবার আমি এক ঘাঁটিতে ইদাদের কোর্সে এ বিষয়ে কথা বললাম| তখন কিছু ভাই আমাকে বললেন, ‘এ কথাগুলো তো নিয়তকে অকেজো করে দেয়| আর জিহাদকে আলস্নাহর রাস্থায় নয়, বরং অন্যদিকে প্রবাহিত করে ফেলে| কারণ আপনি যখন মানুষকে বলবেন, “তোমরা যুদ্ধ করো যাতে করে তোমাদের জীবনযাপনের স্থরটা সুন্দর ও উন্নত হয়|” অথবা “তোমরা যুদ্ধ করো যাতে সম্মানের উচ্চতা হাসিল করতে পারো|” এভাবে আদর্শের বাইরে কথা বলা তো আদর্শ থেকে বের করে নেয়|’ এর জবাব হচ্ছে, কিছু ভাই বুঝেন, দ্বীন খুবই সংকীর্ণ| তারা মনে করেন এসব বিষয়ের মাধ্যমে নিয়ত পরিবর্তন হয়ে যায়| তারা বলেন, আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে আমরা যেন মানুষকে কেবল এ কথাটাই বলি যে, তোমরা আলস্নাহর রাহে কিতাল করো, কেননা আলস্নাহ তোমাদের কিতালের আদেশ করেছেন| কারণ জিহাদ ফরজ| কারণ আলস্নাহ তাআলা বলেছেন, **إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا** - তোমরা যদি যুদ্ধাভিযানে বের না হও, তাহলে আলস্নাহ তোমাদের কঠোর শাস্থি প্রদান করবেন|[১৩]

---

[13] m~iv ZvIev : 39|

এগুলো তো আপন জায়গায় ঠিকই আছে| কিন্তু কতজন মানুষের উপর এ চিন্তাধারার সরাসরি প্রয়োগ করতে পারবেন আপনি? এবং তাদের বলতে পারবেন যে, إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا? এ কথাগুলো তো আকীদার বুঝ সম্পন্ন ভাইরা বুঝবেন| যারা ইমানের মারহালায় পৌঁছেছেন, তারা বুঝবেন| কিন্তু আপনাকে অনেক মানুষকে শরীয়তের ভিন্ন কিছু দরজার মাধ্যমে যুদ্ধে প্রবেশ করাতে হবে| আর সেগুলো হচ্ছে মাকাসিদে শরীয়াহ| যেগুলো শরীয়ত ফরজ করেছে| আর মাকাসিদে শরীয়াহ হচ্ছে দ্বীন, প্রাণ, সম্মান, সম্পদ ও আকল|

তাই যদি আপনি বলেন যে, আমি মুসলিমদের জীবন বাঁচানোর জন্য, মুসলিমদের হত্যার বদলা নেবার জন্য কিতাল করবো, তাহলে এটা কী জিহাদকে আল্লাহর রাস্তায় হওয়া থেকে বের করে নেবে? এটা কী জিহাদকে তার মৌলিকতা থেকে বের করে নেবে? যখন রাষ্ট্রপড়া মানুষের সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করে, তখন যদি আপনি বলেন যে, আপনি এ জুলুমের বদলা নেবেন, তবে কী আপনার সে জিহাদ জিহাদের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হবে, আল্লাহর রাস্তায় না হয়ে অন্য কোনো কিছুর জন্য হবে?

এ সব কিছুই শরীয়তের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। যদি আপনি এগুলো করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ইকামতে দ্বীনের নিয়ত করেন, তবে সেটাও কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ গণ্য হবে।

যদি আপনি মুসলিম জনসাধারণের প্রতি তাকান। তবে দেখবেন যে, তাদের জীবন স্বাভাবিক স্তরে নেই। পশ্চিমা দেশের লোকেরা, আমাদের দেশগুলোর শাসকরা, পশ্চিমাদের পা চাটা গোলামরা বেশ আয়েশে থাকে। ইউরোপের লোকেদের মতো তাদের জীবন কাটে। তাদের খাবার-দাবার প্লেনে চড়ে ইউরোপ থেকে আসে। আর এসব বিলাসিতা তারা মুসলিমদের টাকা-পয়সায় করে। আপনি যদি এসব তথ্য দিয়ে সাধারণ মানুষদের কিতালের প্রতি উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন, তবে সে কিতাল কিতাল ফি সাবিলিল্লাহই হবে।

উপসাগরীয় অঞ্চলের অনেক শাসকের খাবার-দাবার বিদেশ থেকে প্লেনে করে আসে। দুপুরের খাবার ব্রিটেন থেকে প্লেনে করে আসে। রাতের খাবার এমনই কোনো দেশ থেকে আসে। কোনো সময় কারো ইচ্ছা জাগে একটু ফ্রেশ হয়ে আসি, একটু মনটাকে শান্ত করে আসি; তখন সে প্লেনে করে নিউইয়র্কে গিয়ে খাবার খেয়ে আবার ফিরে আসে দেশে।

আপনি যখন এসব তথ্য খেতে না পাওয়া কোনো মানুষকে শোনাবেন, তখন এটাই তার জিহাদের পথে অগ্রসর হবার কারণ হবে। আবু জর গিফারী বলেন, 'আমি সে ব্যক্তিকে দেখে আশ্চর্য হই, যে খাবার না খেয়ে বাড়িতে বসে থাকে, কিন্তু তলোয়ার কোষমুক্ত করে ময়দানে আসে না।'[১৪]

আপনি যদি এ পদ্ধতিতে আগান, তবে তা নিয়তকে পরিবর্তনকারী হবে না। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুতি হবে না। কারণ এসব এমন বিষয়, যেগুলো সংরক্ষণের ব্যাপারে আলস্নাহ তাআলা আদেশ করেছেন। আপনি দ্বীনকে সংকীর্ণ হিসেবে বুঝতে গিয়ে কঠোর হবেন না। প্রত্যেক মানুষের উপর ফরজ আলস্নাহর হাকিমিয়াত প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করা। কিন্তু সব মানুষতো আর হাকিমিয়া বুঝে না। আর পুরো দ্বীনটাই তো হাকিমিয়া না। হাকিমিয়া দ্বীনের একটা প্রধান অংশ, তবে পুরোটা না। দ্বীনের মাঝে মানুষের মৌলিক অধিকারকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আর মানুষের মৌলিক অধিকারগুলো

---

[14] Bgvg Avjevbx in. e‡jb, mb` Mixe| †`Lyb, ZvLixRy Avnv`xwm gykwKjvZzj dvKwi Iqv KvBdv AvjvRvnvj Bmjvg : 13 c„,. 10 bs Avmvi| cÖKvkbv : Avj-gvKZvevZzj Bmjvgx|

মাকাসিদে শরীয়ার একটা অংশ। আর এগুলোকেই আমরা مفتاح الصراع তথা যুদ্ধের চাবি বলি।

বৈপস্নবিক পরিবেশ বা জিহাদী পরিবেশ

নোট পয়েন্ট: **কিতাল ও যুদ্ধের প্রতি, যুদ্ধের বৈধতার প্রতি ও যুদ্ধ করা ন্যায়ভিত্তিক হওয়ার প্রতি একটা জাতি অথবা জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিতুষ্টি ও সমর্থনের অবস্থাকে গেরিলা যুদ্ধের বিশেষজ্ঞগণ المناخ الثوري তথা বৈপস্নবিক পরিবেশ বলে আখ্যা দেন।**

কমিউনিস্ট ও বামপন্থী বিপস্নবগুলোর প্রতি লড়া করলে, আপনি দেখতে পাবেন যে, তারা المناخ الثوري তথা বৈপস্নবিক পরিবেশ পরিভাষাটা ব্যবহার করে থাকে। এ দ্বারা তারা বুঝিয়ে থাকে যে, দেশের পরিবেশ সে পর্যায়ে পোঁছেছে যে পর্যায় ফেটে পড়া বা বিপস্নব-বিদ্রোহ করার উপযোগী। আমরা একে নাম দেবো, المناخ الجهادي তথা জিহাদী পরিবেশ। এর অর্থ হবে, দেশের সাধারণ পরিস্থিতি ও পরিবেশ জিহাদ শুরম্ন করার উপযুক্ত হয়েছে এবং **مفتاح الصراع** তথা যুদ্ধের চাবির প্রয়োগের মাধ্যমে

গণমানুষকে তুষ্ট করে তাদের সমর্থন পাওয়া গেছে, যার ফলে পরিবেশ কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

সিরিয়ায় ইখওয়ানুল মুসলিমিন জিহাদের বিপক্ষে গিয়ে অনেক অপরাধ করেছে। তাদের অপরাধের লম্বা তালিকার মধ্যে একটি হচ্ছে, তারা সিরিয়ায় **مفتاح الصراع** তথা যুদ্ধের চাবিকে বিনষ্ট করার অপচেষ্টায় কাজ করেছে। তারা নিজদের বিবিধ প্রকাশনায় আলাবি শিয়াদের সম্বোধন করে বলতো, *'আমরা আমাদের দেশের নাগরিক আলাবীদের সম্বোধন করছি, যারা হাফেজ আল-আসাদের জুলমের শিকার হয়েছে, যেমনিভাবে মুসলিমরা শিকার হয়েছে হাফেজের জুলমের।'*

সিরিয়ায় **مفتاح الصراع** (যুদ্ধের চাবি) ছিল এটা সাব্যস্ত করা যে, এখানে কিতাল হচ্ছে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামআহ তথা মুসলিমদের মাঝে ও কাফের নুসাইরি ও শাসকশ্রেণীর মাঝে। এ কথাটা দিয়ে মরুভূমির প্রত্যন্ত অঞ্চলের বেদুইনের মাঝেও জাগরণ তোলা সম্ভব। যখন আপনি বেদুইনকে বলবেন, *'তুমি একজন সুন্নি। আর যার বিরুদ্ধে তুমি কিতাল করবে সে হচ্ছে*

নুসাইরি।' এ কথাটা বলে তুমি তার মাঝে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দিলে।

ইখওয়ানের লোকেরা নিজেদের ধার্যকৃত মতানুযায়ী বিদ্রোহকে ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলো, চেষ্টা করলো مفتاح الصراع (যুদ্ধের চাবি)-কে নষ্ট করে দেওয়ার। তারা বলা শুরম্ন করলো যে, নুসাইরি কাফেররাও মুসলিমদের মতো ডিক্টেটরের হাতে নির্যাতিত। এভাবে তারা 'মুসলিম ও নুসাইরিদের যুদ্ধ'কে 'নির্যাতিত ও ডিক্টেটরের মধ্যকার যুদ্ধ' বানিয়ে দিল। ইখওয়ানের পরিবেশ নষ্ট করার এ কাজের কারণে অনেক মানুষ মুসলিম-নুসাইরি যুদ্ধের প্রতি তুষ্ট হলো না, এর সমর্থক হলো না।

'আমি কিতাল করবো, কারণ আমি জুলমের শিকার হয়েছি।' এ কথাটার অর্থ হচ্ছে সরকারের সাথে আহলুস সুন্নাহর যে সকল মানুষের স্বার্থ সংরড়্গিত আছে, যারা সরাসরি কোনো জুলমের শিকার হচ্ছে না; তাদের সাথে, এ শ্রেণীর মানুষের সাথে কিতালের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। কারণ এ শ্রেণীটি তো মাজলুম নয়, নির্যাতিত নয়; তাই তার কিতাল করার কোনো কারণও নেই। কিন্তু, পড়্গান্তরে আপনি দেখবেন, নুসাইরিগণ ঠিকই খেলা বুঝতে পেরেছে ভাল মতো, তারা সংখ্যায় কম।

তারা পুরোই বুঝেছে যে, যখন শক্তির পালস্না উল্টে যাবে, তখন কেবল সরকারের পতনই হবে না, বরং লড়া লড়া সিরিয়ান মানুষ মারা যাবে। (তাই তরা কখনও মাজলুম ও ডিক্টেটরের মধ্যকার যুদ্ধে মাজলুমের পড়া নেবে না-যেমনটা ইখওয়ান চায়) সিরিয়ায় এক মিলিয়ন নুসাইরি ১২ মিলিয়ন সুন্নীর ওপর শাসনের ছড়ি ঘুরায়। লেবাননে ২ মিলিয়ন মুসলিম আছে, আছে ২ মিলিয়ন খ্রিস্টান। বর্তমানে সেখানে নুসাইরিরা সকলের উপর শাসন করছে। অথচ লেবাননে নুসাইরিদের সংখ্যা কয়েক হাজার মাত্র। কিন্তু তবুও লেবাননের শাসন ড়ামতা তাদের হাতে। যদিও তারা সে দেশের সাধারণ মানুষের বিচারে বৈধ সরকার ম্যারোনাইট খ্রিস্টানদের আড়ালে থেকে ড়ামতার কলকাঠি নাড়ে।

যখন কোনো বিপস্নব পরিচালক নিজেই এসে মূল থেকে **مفتاح الصراع** (যুদ্ধের চাবি)-কে নষ্ট করে দেয়, তখন আদতে সে বিপস্নবকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে।

আপনি যদি জাযিরাতুল আরবে বিদ্রোহ ঘটাতে চান, তবে সেখানকার **مفتاح الصراع** (যুদ্ধের চাবি) প্রয়োগ করতে হবে। আর সেটা হচ্ছে, ‘আমেরিকানদের উপস্থিতি’। যদি বিপস্নব শুরম্ন হয়,

আর আপনি বলেন যে, *উলিউল আমর আমেরিকানদের উপস্থিতিকে সমর্থন করেন বলে আমেরিকানদের উপস্থিতি বৈধ স্বীকৃতি এবং আমরা অশস্লীলতা ও পাপাচারিতার প্রসারের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করছি*তবে এসব কথা একেবারে বোগাস কথাবার্তা হবে।

ইয়ামানের একটা উদাহরণ দেখা যাক। শাইখ জিন্দানীকে আপনি দেখবেন, তিনি যুদ্ধের বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন এ বলে যে, 'সংবিধান কিছু কুফরী বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। যখন এসব কুফরী বিষয় উঠিয়ে নেওয়া হবে, তখন যুদ্ধের কারণও শেষ হয়ে যাবে।' এটা হচ্ছে **مفتاح الصراع** (যুদ্ধের চাবি)-কে নষ্ট করা।

অন্যদিকে শুনুন আর উপরের কথাটার সাথে জিহাদী আন্দোলনের উত্তরসূরী শাইখ আবু আব্দুলস্নাহ উসামা বিন লাদেনের কথার সাথে মিলিয়ে দেখুন। তিনি বলেন, 'আমরা ইয়ামানে কিতাল করি, কারণ ইয়ামানের সংবিধান পুরোটা কুফরী। এ কুফরী সংবিধান প্রয়োগকারী ইয়ামানের সরকারও কাফের। আমাদের যুদ্ধ সে দিন শেষ হবে, যেদিন আমরা এ

কুফরী সংবিধানকে ও তার ধারক-বাহকদের শেষ করতে পারবো।’

এ পয়েন্টটা শুনুন। এটাই হচ্ছে মূলকথা। কিতাল শুরম্ন হলে কেবল তখনই কিতাল বন্ধ হবে, যখন হয় আমরা শেষ হয়ে যাবো না-হয় তারা শেষ হয়ে যাবে। অন্যথা কিতাল বন্ধ করার কোনো যৌক্তিকতা থাকবে না।

জিন্দানী আর তার মতো অন্যদের ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। যখন তারা কিতাল শুরম্ন করবে। সরকার যদি দেখে যে, এ যুদ্ধের মাঝে তাদের পথ ও পরিস্থিতি সংকীর্ণ। তখন সরকার তাদের বলবে, ‘আমরা চিন্তা করে দেখলাম। আমাদের কাছে স্প ষ্ট হল যে, তোমরাই সত্য বলছো। আমাদের বলে দাও, সংবিধানের কোন কোন বিষয়টা কুফরী। আমরা সেগুলো পরিবর্তন করে দিচ্ছি।’ আসলেও সরকার সংবিধানের লেখা থেকে কিছু কুফরী বিষয় মুছে ফেলবে। কিন্তু তারা অন্য পন্থায় আবারো সে সব কুফরীকে পুনর্বহাল করবে। বাস্তবে কোনো কিছুই পাল্টাবে না। সবটাই আগের মতো থেকে যাবে। অন্যদিকে যারা ময়দানে নেমে ছিল *সরকার কুফরী বিষয় মুছে ফেলছে*এ ধোঁকার প্রতিক্রিয়ায় তারা ময়দান ছেড়ে যাবে। আর তাদের সামনে যুদ্ধ

করার মতো কোনো কারণও আর থাকবে না। অথচ পরিস্থিতি তখনও আগেরই মতো থেকে যাবে।

এ জন্য যারা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মনমানসিকতার হয়, আপনি তাদের দেখবেন, তারা যুদ্ধের প্রথম থেকেই সন্ধির মানসিকতা নিয়ে বসে আছে। অর্থাৎ যুদ্ধের প্রথম থেকে আপনি তাদের মাঝে কিতাল বন্ধ করে দেওয়ার ইশারা পাবেন। যদি তারা কিতাল করে তবে এটা দেখবেন। তাদের মানসিকতার কারণে দেখবেন, যুদ্ধ করলে যখন তাদের সামনে সন্ধি বা কিছু আপোস উপস্থাপন করা হবে, তখন তারা তা কবুল করে নেবে অনায়াসে আর আপোস করে নেবে।

অনেক ভাই আমাকে বলেছেন, জিনদানী বলেন, *‘পৃথিবীতে কেবল দুটো রাষ্ট্র আলস্নাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক শাসন-বিচার করে। সাউদি ও উত্তর ইয়ামান।’* এ মনমানসিকতার লোকেরা কীভাবে চিন্ত্মা করে, সেটা বুঝানোর জন্যই এ কথাটা উলেস্নখ করলাম। সাউদি সরকারকে ঘিরে কিছু দিন একটা সন্দেহ কাজ করেছে যে, তারা কী শরীয়ত মোতাবেক শাসন করে না অন্য কিছু? কিন্তু এখন স্পষ্ট যে, সাউদি সরকার শরীয়ত মোতাবেক চলে না। কিন্তু কবে থেকে

ইয়ামান সরকার আলস্নাহর নাজিলকৃত বিধানে শাসন-বিচার করছে? আমরা কখনও কাউকে এমনটা দাবী করতে শুনিনি। অনেক আগ থেকেই সকলের জানা আছে যে, ইয়ামানের সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন গোত্রের বিশেষ ব্যক্তি, পশ্চিমা আইন-কানুন ও কিছু ইসলামী নীতির মিশ্রণ। এ মিশ্রণে ইসলামী নীতি এসে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, অনেক দিন থেকেই ইয়ামানের সংবিধানে লেখা আছে যে, ইসলামী শরীয়ত সংবিধানের আইন প্রণয়নের একটা উৎস। আর দ্বিতীয় আরেকটা কারণ হচ্ছে, ইসলামী কিছু লোক কম্যুনিস্টদের সাথে, বার্থ পার্টির লোকদের সাথে পার্লামেন্টে বসার সুযোগ পায়। ব্যস এতটুকুই। কিছু ইসলামী নীতি থাকা, পার্লামেন্টে কতক ইসলামী সদস্যের উপস্থিতি বাস্ত্মবতাকে পাল্টে দেয় না। এতটুকুতেই একটা সরকার শরয়ী শাসকে রূপান্ত্মরিত হয়ে যায় না।

এ লোকটা ইয়ামানে যুদ্ধ শুরম্ন হওয়ার আগেই **مفتاح الصراع** (যুদ্ধের চাবি)-কে নষ্ট করে দিল। কারণ **مفتاح الصراع** (যুদ্ধের চাবি) আপনার উত্থাপিত আদর্শের সমন্বয়ে উঠে আসে। আপনি বলবেন, আমরা এ এ কারণে যুদ্ধ করি। আমরা যুদ্ধ করি যেন আলস্নাহর দ্বীন পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। অর্ধেকও না, এক চতুর্থাংশও না, ৯৯.৯% না। বরং পুরো দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করাই

আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য| যখন আপনি এ আদর্শটি উপস্থাপন করবেন| তখন যারা আপনার সত্যিকার বন্ধু তাদের সকলকে আপনার পাশে পাবেন| আর যারা আদতেই আপনার শত্রু, তাদের পাবেন আপনার সামনে, আপনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে| আর এভাবেই বিষয়টা স্প ষ্ট হয়ে যাবে|

مفتاح الصراع (যুদ্ধের চাবি) হচ্ছে সে আদর্শটা, যেটার ব্যাপারে আপনি গণমানুষকে পরিতৃপ্ত করবেন, তাদের সমর্থন আদায় করবেন| আর যখনই জিহাদী আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন, তখন আপনি এ আদর্শটাই তাদের সামনে উপস্থাপন করবেন| বিষয়টা বুঝা গেল?

আমরা আলোচনার নোট পয়েন্টে ফিরে যাচ্ছি, কিতাল ও যুদ্ধের প্রতি, যুদ্ধের বৈধতার প্রতি ও যুদ্ধ করা ন্যায়ভিত্তিক হওয়ার প্রতি একটা জাতি অথবা জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠের পরিতুষ্টি ও সমর্থনের অবস্থাকে গেরিলা যুদ্ধের বিশেষজ্ঞগণ المناخ الثوري তথা বৈপ্লবিক পরিবেশ বলে আখ্যা দেন|

আর আমরা বলি المناخ الجهادي তথা জিহাদী পরিবেশ বা গণমানুষের নিকট জিহাদের যৌক্তিকতা তৈরি হওয়া| ইরাকের

উপর চলা দখলদারিত্বের সময় ইরাকের এক কবি বিপস্নবের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইংরেজদের সামনে বলেছিলেন,

فإما إلى حيث تبدو الحياة لعينيك سليمةً تغنم

وإما إلى جدث لم يكن ليدخله بيتُك المظلم[15]

অর্থাৎ, ওঠো| সম্মানিত জীবনের জন্য কিতাল করো, যুদ্ধ করো| অথবা যেভাবে এখন জীবন পার করছো এভাবে কবর পর্যন্ত্ম যাও| এখন তুমি অন্ধকার এক ঘরে বসে আছো| খাবার নাই| পানীয় নাই| মানুষ যখন এমন পরিস্থিতিতে পড়ে| হারানোর মতো তার কাছে আর কিছুই না থাকে| তখন সে যুদ্ধ না করে পারে না| এ পরিবেশের ব্যাপারে আমরা বলি المناخ الجهادي তথা জিহাদী পরিবেশ বাস্ত্মবায়িত হয়েছে|

আমরা যদি এখন জাযিরাতুল আরবের দিকে লড়্গ করি, তবে দেখবো যে, সেখানে বৈপস্নবিক পরিবেশ নেই| একবার জাযিরাতুল আরব থেকে আগত এক ভাইয়ের সাথে কথা হয় সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে| তিনি বলেন, ‘সেখানে পরিস্থিতি খুবই নাজুক| আশ্চর্য অধঃপতনের অবস্থা বিরাজমান মানুষের মাঝে|

---

[15] BivKx Kwe gynv¤§v` gvn`x Avj-RvIqvwnix| أخي جعفر KweZv †_‡K DrKwjZ|

এমনকি যখন কেউ শ্যাম্পু কিনতে যায়, সে ঘোরে পড়ে যায় যে, কোন শ্যাম্পুটা কিনবে?! তার সামনে ২০ ধরণের শ্যাম্পু থাকে। তাকে সেখান থেকে বাছাই করতে হবে কোন শ্যাম্পুটা কিনবে সে। যখন সাবান কিনতে যায়, ৫০ পদের সাবান পায়। এসি কিনতে গেলে ইংলিশ কোম্পানী, আমেরিকান জেনারেল মোটরস কোম্পানী, জাপানী নাশলান কোম্পানী প্রভৃতি সামনে এসে দাঁড়ায়। তখন সে এসব নিয়ে ডুবে থাকে, দিশেহারা বিভ্রান্ত থাকে যে, কোনটা উত্তম। এমন ঠুনকো বিষয়ে যার দিন কেটে যায়, সে কীভাবে কিতাল করবে?'

আপনি সেখানে মানুষের জীবনযাত্রা কিছু কাজের মাঝেই সীমাবদ্ধ পাবেন। মসজিদে যাওয়া, মসজিদ থেকে আসা, ব্যবসা করা। ব্যস। এটাই তার জন্য যথেষ্ট। এতটুকু করেই সে বলে, *'আমি রব্বুল আলামিনের ইবাদতের হক আদায় করে ফেলেছি।'*

যারা ৯৯% দ্বীনি মূল্যবোধ থেকে প্রথম পর্যায়েই জাগরিত হয়, তারা হচ্ছেন বিশেষ শ্রেণীর মানুষ, তারা হচ্ছেন মুসলিমদের মধ্যকার শ্রেষ্ঠজন। কিন্তু সাধারণ মানুষজন তখনই কিতালে আসেন, যখন দেখেন তাদের জীবনযাত্রা হুমকির সম্মুখীন। কেননা তাদের মধ্যকার দ্বীনি মূল্যবোধ চলে গেলেও, তাদের

মাঝে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদাবোধ কিছুটা হলেও বাকি থাকে| তাই খাদ্য-পানীয়ের সংকট, জীবনযাত্রা হুমকির সম্মুখীন হওয়ার পর, এ দরজা দিয়ে কিতালে প্রবেশ করে অনেক মানুষ|

আলহামদুলিলস্লাহ| বিষয়টা কেবল সময়ের ব্যাপার| মিডল ইস্টে এ দখলদারিত্ব অচিরেই মুসলিমদের খাদ্য সংকটের কারণ হবে| এখন খনিজ তেলের মালিকদের কাছ থেকে খনির মালিকানা কিনে নেবার পরিকল্পনা চলছে| এভাবে পরিকল্পনা চলছে সুয়েজ খাল পুরোটা অধিকার করে নেবার এবং মুসলিমদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার| ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে, যখন তারা বর্তমানে যেসব মুসলিম এগুলোর নিয়ন্ত্রণ করছে, একসময় এ মুসলিমদের গোণায় ধরবে না তারা| এমনকি দখলদারদের মিত্র হয়ে যে সকল সরকার এখন আছে, তারাও অবহেলিত হবে দখলারদের কাছে| কিছু সময় পর মুসলিমদের ব্যাপক দুর্ভিড়্োর সম্মুখীন পাওয়া যাবে| এমনকি উপসাগরীয় অঞ্চলের মুসলিমরাও অনাহারে দিন কাটাবে|

যখন এসব পরিস্থিতি আসবে, তখন মিডল ইস্টের একজন মুসলিম নিজকে ড়্াতিগ্রস্থ দেখবে, এমনকি অর্থনৈতিক দিক

থেকেও। কারণ তখন পুরো অঞ্চলের অর্থনীতি বিধ্বস্থ হয়ে যাবে। তখনই المناخ الجهادي তথা জিহাদী পরিবেশ গড়ে উঠবে।

যখন দ্বীনি আদর্শগত কারণ অর্থনৈতিক কারণ, আত্মসম্মানের কারণ, আত্মমর্যাদার কারণ, মানবিক কারণ সম্মিলিত হবে; তখন এ সবগুলো কারণ মিলে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত একটি পরিবেশ তৈরি করে একটা পর্যায়ে নিয়ে যাবে, যে পর্যায়ে আপনি প্রতিরোধের হামলা শুরম্ন করতে পারবেন।

আফসোস করে বলছি, যুদ্ধ শুরম্ন করার চাবিকাঠি কিছু দেশে বিরাজমান আছে, যেমন- শামে আছে, কিন্তু শামের জিহাদী আন্দোলন পিছে পড়ে আছে; তেমনি এ পরিস্থিতি জর্দানেও আছে, অর্থাৎ গণমানুষ প্রস্তুত আছে, সমর্থনে আছে...যৌক্তিকতা ও পরিস্থিতি প্রস্তুত আছে। কিন্তু...

কিন্তু বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের নেতাদের অবস্থা শোচনীয়। উদাহরণত, একটা সিংহদলের নেতৃত্ব দিচ্ছে একটা ভেড়ী। যখন চিতা বের হয়ে একটা চিৎকার মারে, তখন নেতৃত্বে থাকা ভেড়ী পালিয়ে যায় ভয়ে। দলের সব সিংহ দেখে যে, কিছুই করার নেই। তখন তারাও যে যেভাবে পারে পালিয়ে যায়।

কিন্তু একপাল ভেড়ার নেতৃত্বে যদি একটা সিংহ থাকে| আর তখন যদি কোনো চিতা এসে তাদের সামনে দাঁড়ায়| তখন সিংহের একটা গর্জনেই চিতা দূরে পালিয়ে যায় | আর তখন ভেড়াগুলো সিংহের চরিত্র ধারণ করে সিংহে পরিণত হয়|

নেতাদের ভূমিকা গুরম্নত্বপূর্ণ এবং খুবই স্পর্শকাতর| আফসোসের কথা হচ্ছে, ইসলামী কাজ ও জিহাদী আমলের আন্দোলন -আলস্নাহ যতটুকু দয়া করেছেন, তা ব্যতীত- প্রথম পর্যায়েও উন্নীত হয়নি| কিছু নতি-স্বীকারকারী শাইখ আছেন, যাদেরকে তাদের নেতা সামনে-পেছনে নিচ্ছেন| এতে করেই সংখ্যাটা বড় দেখাচ্ছে|

মাগরিবের মতো অঞ্চলে জিহাদের কাজ এখনও অনেক পিছিয়ে| সেখানে জিহাদী পরিবেশ নেই| ইসলামী আন্দোলন নেই বললেই চলে| অন্য অঞ্চলের সাথে সংখ্যার তুলনায় মাগরিব থেকে আগত ভাইদের সংখ্যা নগণ্য| মনে হয় সর্বসাকুল্যে তাদের মোটসংখ্যা হবে পুরো দেশ থেকে ৫ থেকে ১০ জন| আর প্রত্যেককেই আপনি দেখবেন ভীত ও আতঙ্কিত যে, হয়তো তাকে কেউ দেখে ফেলেছে এবং তার সম্পর্কে বলে

দিয়েছে। আশ্চর্য এক ভয়। আশ্চর্য এক পরাধীনতা। তাই আপনি দেখবেন সেখানকার কাজ প্রশমিত হয়ে আছে।

তিউনিসিয়ায় কাজের কোনো উপযুক্ততা নেই। কারণ সে দেশটাই এমন। মানুষ সেখানকার পরিবেশ দেখে খুবই আশ্চর্য হয়। ইউরোপ থেকে কেউ তিউনিসিয়া এলে, ইউরোপে আর তিউনিসিয়ার মাঝে কোনো বেশি পার্থক্য অনুভব করে না। তিউনিসিয়ায় ইসলামের কাজ হয়েছে খড়-কুটো বরাবর, খুবই সামান্য। সেখানটা ফাঁকা। আর সেখানে একমাত্র ইসলামী আন্দোলনটি হচ্ছে ঘানুশীর নেতৃত্বে। কিন্তু তার আন্দোলনের প্রধান ভিত্তিই হচ্ছে জিহাদ বিরোধী, গণতন্ত্রী এবং অনৈসলামিক।

কিন্তু এমনও রাষ্ট্র আপনি পাবেন, যে রাষ্ট্রে জিহাদী পরিবেশ রয়েছে, জিহাদ করার উপযুক্তকতা রয়েছে। অথবা আমরা যেটাকে المناخ الجهادي বলি, সেটা রয়েছে। জিহাদী পরিবেশ উত্তপ্ত রয়েছে। যেমন ইয়ামান। সংবিধান না থাকা অবস্থায় সেখানে জিহাদী পরিবেশ ছিল। আমরা অনেক গুরম্নত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে এ বিষয়ে বলেছি। বলেছি, জিহাদ শুরম্ন করার ব্যাপারটি। তাদের এও বলেছি যে, সময় যত গড়িয়ে যাবে, ইয়ামানে কিতাল শুরম্ন

করতে যত বিলম্ব হবে, ততই পরিবেশের উত্তপ্ততা ও লড়াইয়ের কারণ-আসবাবের মাত্রা কমতে থাকবে|

আমাদেরকে বুঝতে হবে, কীভাবে ও কখন আমাদের মানুষের কাছে যেতে হবে| যদি আমরা ইয়ামানের মানুষকে বলতাম, ‘আমরা এখানে ইয়ামানে এসেছি কিতাল করার উদ্দেশ্যে| কারণ এখানকার শাসক আলস্নাহর শরীয়ত ছেড়ে মানবরচিত সংবিধান দিয়ে শাসন-বিচার করে|’ তখন একজন মানুষ এগিয়ে এসে আপনাকে বলতো, ‘সাউদিতেও মানরচিত আইনে শাসন-বিচার চলার অপরাধটি ঘটছে| তাছাড়া তারা জাযিরাতুল আরবে আমেরিকানদের ঢুকতে দিয়েছে| কব্জা করতে দিয়েছে|’

সে সময় পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ ছিল| লড়্গা লড়্গা মানুষ বিড়্গোভে নামতো আর সবাই জিহাদের প্রতি আহ্বান করতো| মানুষ অপেড়্গা করছিল যে, ইসলামী আন্দোলন তাদের নেতৃত্ব দেবে| কিন্তু ইসলামী আন্দোলন তো অধঃপতনের মাঝে নিপতিত ছিল| ইসলামী আন্দোলনের নেতারা আগ্রহী ও উৎসাহী গণমানুষকে নিবৃত্ত করে দিল| যেমন একবার জিনদানী বলল, *যখন মানুষ কুফরী সংবিধানের বিরম্নদ্ধে ভোট দেওয়ার পরও সংবিধান পড়্গা জিতে যায়, তখন আমরা জিহাদের ঘোষণা*

দেবো। যেমনি আব্বাস মাদানী বলেছিল, *যদি এমন এমন ঘটে, তবে আমরা অচিরেই জিহাদের ঘোষণা দেবো। যদি সেনাবাহিনী নামে, তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।* অর্থাৎ এভাবেই জিহাদের প্রতি উৎসাহী বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষকে ইসলামী নেতৃত্ব কেবল কথার হৈচৈ এর মাধ্যমে নিবৃত্ত করেছে। কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

আলজেরিয়ায় দশ সদস্যের একটি টহল দল এসে আব্বাস মাদানীকে ঘরের মাঝখান থেকে ধরে নিয়ে গেল। একটি বুলেটও তাদের খরচা করতে হয়নি। তারা দশ জনের পরিবর্তে যদি দুজনকেও পাঠাতো। তবুও শান্তভাবে আব্বাস মাদানীকে ধরে নিয়ে যেতে পারতো। এরকম আরেক টুকরি টহলদার আসল মসজিদের দরজায়। ইমাম ও বাকীদের ধরে নিয়ে গেল।

ইয়ামানের কথায় ফিরে যাই। সংবিধান পড়া বিজয়ী হল ৯৯% হারে। তখন মানুষ বিক্ষোভে নামল। এ বিক্ষোভের অগ্রভাগে ছিল ইসলামী আন্দোলনের প্রমুখ নেতা। তাদের একজন ছিলেন জিনদানী। ইতোপূর্বে তার একটা কথা উদ্ধৃত করেছি আমরা। তারা সবাই গণভবনে গেল। প্রধানমন্ত্রী তাদের বলল, *'তারা যেন নিজদের প্রতিনিধি দল পাঠায়, যে প্রতিনিধিরা তাদের সাথে*

কথা বলবে এবং তাদের বিক্ষোভের উদ্দেশ্য উপস্থাপন করবে।' যেমন কথা, তেমন কাজ। বিক্ষোভকারীগণ ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বানালো। ইসলামী নেতৃত্ব ভবনের ভেতরে গেল। প্রতিবাদ করলো। এরপর বেরিয়ে এল। অথচ ইসলামী নেতৃত্ব ইতোপূর্বে মানুষকে ওয়াদা দিয়েছিল যে, তাদের আন্দোলন সফল না হলে, সংবিধান পড়া জিতে গেলে জিহাদ ঘোষণা দেওয়া হবে, কিতাল করা হবে। এখন যখন সংবিধান পড়া ঠিকই জিতলো, ইসলামী নেতৃবৃন্দ ওয়াদার কথা ভুলে গেল এবং মুখে প্রতিবাদ করে চলে এল।

জর্দানের ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এক বড় ব্যক্তিত্বকে বলতে শুনলাম তিনি সিরিয়ান এক ইখওয়ানকে বলছিলেন, *'আমরা বুদ্ধিমান। আমরা সিরিয়ায় অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। ইখওয়ান সিরিয়ায় যে জটিলতায় পড়েছে সে জটিলতায় আমরা পড়বো না। আমরা কখনও সামরিক কার্যক্রমে যাবো না।'* দেখুন আপনারা, সিরিয়ায় জিহাদ অকেজো করণের প্রক্রিয়ায় তাদের সাথীদের এবং তাদের পথ-পদ্ধতীর ব্যর্থতার বিষয়ে তারা নিজেরাই সাক্ষ্য দিচ্ছে। বলছে, জিহাদ বা কোনো সামরিক কার্যক্রম পরিচালনা উচিত হবে না। অর্থাৎ তারা যে কোনো প্রকার ওজরে সামরিক কার্যক্রম থেকে দূরে থাকবেই থাকবে।

ইসাম আত্তার একবার সিরিয়ায় সরকারের উদ্দেশে গর্ব করে বলেছিলেন, *‘আমি আমার এক আঙুলের ইশারায় লাখো মানুষ রাস্তায় বের করার সামর্থ্য রাখি।’* এরপর একবার তিনি হজে গেলেন। ১৯৬৮ কি ১৯৬৯ এর কথা এটা। ফেরার সময় তাকে দেশে ঢুকতে দেওয়া হয় না আর। সরকার তাকে বলে, আপনি সিরিয়ায় আসতে পারবেন না আর। সরকার সিরিয়ায় তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করল। তাকে লেবাননে নির্বাসন দিল। কিন্তু তিনি আঙুলে ইশারা দিতেও পারলেন না। আর কোনো বিক্ষোভও বেরোল না। এরপর লেবানন থেকেও তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। তিনি জার্মানীতে পাড়ি জমান। সে সময় থেকে এখনও অর্থাৎ প্রায় ২০ বছরের বেশি সময় ধরে ইসাম আত্তার জার্মানীতে। এ থেকে আপনারা বুঝে নিন। এসব মানুষের কোনো পুঁজি নেই। সরকারও তাদের কোনো দাম দেয় না। কারণ তারা কোনো কিছু করতে অক্ষম। কিছু করারই ক্ষমতা রাখেন না তারা। অন্যদিকে চিন্তা করুন, একজন লোক। তার কাছে ২০ জনের একটি দল আছে কিতালের জন্য প্রস্তুত। আর তাদের এ কিতাল ফি সাবিলিল্লাহই সরকার বা দখলদারদের হুমকি দেওয়ার সক্ষমতা রাখে। এদেরকেই সবাই সমীহ করে। এদের

কার্যক্রমেই তারা ভীত হয়| এরা থাকে তাদের হিসেবের উচ্চ তালিকায়|

শিয়া হিযবুলস্নাহর দিকে লড়্গ্য করম্নন| শিয়াদের ছোট একটা দল| অবস্থান দড়্গিণ লেবাননে| ইরানের সমর্থনপ্রাপ্ত| আপনি দেখবেন, ইজরাইল আরব রাষ্ট্রগুলোর সবগুলোর সাথে লম্বা আলোচনায় বসতে অস্বীকার করে| তবে যেড়্গেত্রে ইজরাইলের আগ্রহ থাকে, সেড়্গেত্রে বসে| অন্যথা নয়| কিন্তু, অপরপড়্গে দেখুন, হিজবুলস্নাহর সাথে ইজরাইল লম্বা সময় ধরে আলাপ-আলোচনা করে| কারণ হিজবুলস্নাহ কিছু ইজরাইলী ও ডাকাতদের দড়্গিণ লেবাননে উৎপাটিত করতে সড়্গম হয়| এরপর হিযবুলস্নাহ দাবি করে আমরা এ এ চাই| এটা কেন হল? কারণ হিজবুলস্নাহ দলটি হচ্ছে সে সকল মানুষের দল যারা হুমকী দেবার সামর্থ্য রাখে, ভয় দেখাবার জোর রাখে| তাই অন্য মানুষও তাদের সম্মান দেয়, গোণায় ধরে|

এ বিষয়টাই পুরো বিশ্বে বিরাজমান| শক্তের ভক্ত, নরমের যম| রিচার্ড নিক্সন ঞ্চযব জবধষ ডধৎ এ একটা কথা বলেছিল| এটা পেশওয়ারেও প্রকাশিত হয়েছে| আপনাদের কাছে একটা কপি এসেছিল সম্ভবত| নিক্সন বলে, *'জাতিসংঘ নিজের মনমাফিক যে*

কোনো কিছু করার অধিকার রাখে। এ অধিকারটি শক্তিশালীর থাকে।' অর্থাৎ আমরা শক্তিশালী। তাই আমরা যা ইচ্ছে করবো। আমরা যেটা ইচ্ছে করবো, আর সেটা মানুষের উপর চাপিয়ে দেবো। মানুষ তা মানতে বাধ্য।

মুসলিমরা যদি কিতাল ও জিহাদের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়, এটাকে সমর্থন না দেয়। তবে তাদের কথা, তাদের কাজ, তাদের অস্তিত্ব তেমনই হবে, যেমনটা রাসুল সালল্লালল্লাহু আলাইহি ওয়াসালল্লাম বলেছেন, '**وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ**' (কিন্তু তোমরা সেদিন হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া খড়-কুটোর মতো।) অর্থাৎ আমাদের কোনো মূল্য থাকবে না। আমরা এখানে জাতি বিষয়ে কথা বলছি। কথা বলছি তাদের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে। কারণ আমাদের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। আর আমাদের শক্তিটা তখনই সঞ্চয়িত হবে, যখন আমরা মানুষকে কিতালের প্রতি তুষ্ট করতে পারবো ও তাদের সমর্থদাতা বানাতে পারবো।

দ্বিতীয় পয়েন্ট: গেরিলা রণনীতি একটি পদ্ধতি ও শাস্ত্রের নাম। বিশৃঙ্খল কোনো কিছু নয়।

দ্বিতীয় পয়েন্টের আলোচনায় আমরা। নোট : **পূর্বোক্ত পয়েন্টের পরে এখন যে পয়েন্টটি উলেস্নখ করছি, সেটা অত্যন্ত গুরম্নত্ববহ। এ পয়েন্টটি যথাযথ সংরক্ষণ করা আবশ্যক। সেটা হচ্ছে, গেরিলা যুদ্ধের ব্যাপারে অনেক সময় غير النظامية (নন সিস্ট্যামেটিক) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ শব্দের বাহ্যিকতা থেকে অনেকে আসল ধারণাটা বুঝতে ভুল করেন। যেমন, অনেক মুজাহিদ غير النظامية শব্দটির অর্থ করেন الحرب الفوضوية أو الفوضى العسكرية (বিশৃঙ্খল যুদ্ধ বা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সামরিক অবস্থা)। কিন্তু বিষয়টা আদৌ সঠিক নয়।**

অর্থাৎ আপনাদের মধ্যকার যে জন গেরিলা যুদ্ধ সম্পর্কে পড়েছেন অথবা আপনাদের ধারণা আছে যে, গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে غير النظامية (নন সিস্ট্যামেটিক)। আমরা যখন এ শব্দ ব্যবহার করি, তখন অনেক মানুষ মনে করে এর অর্থ হচ্ছে বিশৃঙ্খল যুদ্ধব্যবস্থা। অর্থাৎ যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকে যে যার মতো যুদ্ধ করে যায়।

আফগানের জিহাদী অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে, তারা এ পয়েন্টটি ভাল বুঝতে পারবেন| আপনারা আফগানের পরিস্থিতি অবলোকন করেছেন| দেখেছেন যে, একজন ভাই ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে নামে| পেশাওয়ারে আসে| এরপর নিজের পছন্দমত একটা বাড়িতে উঠে পড়ে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা ছাড়াই| এরপর নিজের পছন্দসই একটা মুআসকারে চলে যায়| নিজে যেমন চায়, তেমন করে বাছাই করে নেয়| আমি তাদের একজনকে মাইক্রোফোনে বলতে শুনেছিলাম, ‘এ গাড়ি খালদুন শিবিরে যাবে| আসো হে যুবক|’ যেন কোন সবজিবিক্রেতা তরকারি বিক্রি করছে| আলু লাগবে? গাজর আছে, লাগবে? লেবু লাগবো কারো? এরপর ক্রেতা এসে নিজের পছন্দমাফিক সবজি কিনে নিচ্ছে| তেমনি যে যার মতো এসে বলবে, ওয়াল্লাহি আমি যাবো খালদুন| এমনকি আমি এমন কিছু মানুষকেও দেখেছি যারা সরাসরি ফ্রন্টলাইনে চলে যাচ্ছে কোনো রকমের প্রশিক্ষণ ছাড়াই! আরও বলছে যে, আমি প্রশিক্ষণ শিবিরে যেতে চাই না| যে যেমন চায়, তেমন করছে|

এরপর প্রশিক্ষণ শিবিরে আসল| ধরুন ২/৩ মাসের কোনো প্রশিক্ষণে অংশ নিল| এরপর দেখবেন, তিন নয়, দশ নয়, কেবল এক সপ্তাহ পরেই যেভাবে ইচ্ছা চলে যায় প্রশিক্ষণ

শিবির ছেড়ে| অর্থাৎ যখন ইচ্ছে নিজের সামানপত্র গুছিয়ে চলে যায়| আর তাকে নিষেধ করতেও পারে না কেউ| এরপর নিজের ইচ্ছে মতো একটা ফ্রন্ট লাইনে গিয়ে অবস্থান নেয়| এরপর যখন ফ্রন্ট লাইনে গিয়ে পৌঁছে, তখন তার সময়টা ভাল কাটে না| তাই যখন ইচ্ছে সেখান থেকেও সরে যায় সে|

চিন্তা করে দেখুন, একজন মুজাহিদ যখন ইচ্ছে এল, নিজের ইচ্ছে মতো প্রশিক্ষণ শিবির বাছাই করলো, যতটা সময় ইচ্ছে থাকলো, যে ফ্রন্টে যাওয়ার ইচ্ছে করলো সেখানে চলে গেল, নিজের ইচ্ছে মতো অস্ত্র বাছাই করে নিল, নিজের ইচ্ছে মতো যুদ্ধের প্রাঙ্গন বাছাই করে নিল, এরপর নিজের ইচ্ছে মতো সরে চলে গেল| যদি এভাবে এ বিষয়টি বিশৃঙ্খলায় ও অপরিকল্পিতরূপে চলতে থাকে, তবে প্রকৃতপক্ষে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়| যদি যুবকদের একটা গ্রুপ নিজদের প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধানের জন্য নিজদেরকে নেতৃবৃন্দের হাতে সঁপে না দেয়, তবে আরবদের এ জিহাদের কোনো ইতিবাচক ফলাফল আসবে না|

এক ভাইয়ের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে শুনুন| আমাকে বলেন যে, দুবছর আগে যুদ্ধের সময় জালালাবাদের অপারেশনে অংশ নেয়

সে। সে সময় ১০ জন ভাই নিয়ে জালালাবাদে প্রবেশ করে। আর ফেরার সময় সে সব ভাইকে খুঁজে নিয়ে তাদের গুণে নেয়। হিসেব করে দেখে এনেছিল দশ জন। কিন্তু এখন তো এগারো জন। আশ্চর্যতা প্রকাশ করলো সে ভাইটি। কীভাবে দশ জন নিয়ে এসেছিল আর কীভাবে আরও একজন বাড়িয়ে ১১ জন নিয়ে ফিরেছিল। এরপর নিজের কাছে থাকা তালিকাটা আরেকবার যাচাই করে দেখলো যে, একজন নতুন ইয়ামানি যুবক তাদের সাথে এসে জুড়েছে। ভাইটি ইয়ামানি সে যুবককে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথা থেকে এলে তুমি?' যুবকটি উত্তর দিল, 'আকস্মিকভাবে, হে শাইখ।' একদল মানুষ যুদ্ধক্ষেত্রে আসছে অথচ কেউ টের পাচ্ছে না। আবার যখন তারা বের হয়ে যাচ্ছে তখনও টের পাচ্ছে না কেউ। কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। আকস্মিকভাবে তারা প্রবেশ করছে আর বের হয়ে যাচ্ছে। জালালাবাদে এরচে বেশি সমস্যার ব্যাপার ঘটেছে। অনেক যুবক বিভিন্ন তাশকিলে প্রবেশ করতো, এরপর যুদ্ধের মাঝখান দিয়েই বেরিয়ে যেতো। এ কথাটি অনেক দুঃখজনক আমাদের জন্য। অনেক হতাশা ও নিরাশার। এ দুঃখ ও হতাশার আদি-অন্ত নেই। আলহামদুলিল্লাহ আফগানিস্তানের এ যুদ্ধ ক্ষেত্রটি কেবল আমাদের আরবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে অনেক

মানুষ আছেন। অন্যথা, যদি এ যুদ্ধ স্রোতটি কেবল আমাদের আরবদের মাধ্যমে গঠিত হতো, তবে বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ হয়ে যেত এটা।

এ কথাগুলো গেরিলা যুদ্ধ غير النظامية (নন সিস্ট্যামেটিক) হওয়ার বিবরণ। যুদ্ধ সামরিকভাবে غير النظامية হওয়ার অর্থ এ নয় যে, সেটা বিশৃঙ্খল হবে! যে যেভাবে ইচ্ছে এতে যুক্ত হবে, নিজের ইচ্ছে মতো করবে, এরপর চলে যাবে!

একটা দুঃখজনক উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের। কান্দাহার জেলে বন্দী হয়ে থাকা এক আফগান বন্দী বের হয়ে আসল। আমাদের কাছে সে আফগান এক লেবানিজ যুবকের চিঠি নিয়ে আসল। লেবানিজ যুবকটা কান্দাহারের সে জেলে বন্দী ৫ বছর ধরে। এ যুবকের ব্যাপারে কোনো খবর নেই আমাদের কাছে। কোন আরবী অঞ্চল হয়ে সে এখানে এসেছে তার কোনো উলেস্নখ নেই তালিকায়। এ লোকটি পূর্বে যেমন বলেছিলাম, সেরকম কোনো এক পদ্ধতিতে আফগানে আসে। এখানে এসে গ্রেফতার হয়ে যায়। অথচ কেউ তার ব্যাপারে কিছুই জানে না। লোকটা চিঠিতে উলেস্নখ করেছে যে, যখন বন্দী বিনিময়ের কোনো সুযোগ আসে, তখন যেন তাকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয। যেন

আরবদের বলা হয় তার এ নাম, আর সে অমুক জেলে বন্দী। কিছু ভাই তার নাম কমান্ডার হক্কানীর কাছেও পৌঁছে দেয়। কারণ খোস্ত বিজয়ের সময় তার হাতে কিছু বন্দী আসে।

বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতির আরেকটা উদহারণ এমন। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এক মুজাহিদ শহীদ হলেন। কেউ তার নামটি পর্যন্ত জানেন না। তখন কিছু ভাই আল-জিহাদ ম্যাগাজিনে এ নিয়ে গর্ব করে লিখলেন যে, *একজন ভাই শহীদ হয়েছেন অথচ কেউ তার নাম পর্যন্ত জানেন না।* যেন এটা চমৎকার কিছু। যেন এটা নিয়ে গর্ব করা যায় যে, একজন মুজাহিদ শহীদ হয়েছেন অথচ কেউই তার নাম জানেন না, তার ব্যাপারে কিছুই জানেন না!

আমি এখানে বিশৃঙ্খলার কিছু উদাহরণ দিয়েছি মাত্র। এর অর্থ এটা নয় যে, পুরো ময়দানের অবস্থাই এমন।

উপদেশ দেওয়ার জন্য, বুঝানোর জন্য উদাহরণগুলো দিচ্ছি। আতঙ্কিত, ভীত করার জন্য নয়। এজন্য দিচ্ছি না যে, এখানে দুয়েকটা দোষ ও রোগ আছে বলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে এখান থেকে সরে যেতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, কিছু সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক সফলতা পেয়েছি। আমরা আমাদের এ সফলতায় সন্তুষ্ট ও আনন্দিত। কিন্তু আপনি যদি সফলতা-বিফলতার

হিসাবটা টেনে দেখেন, পরিসংখ্যান করেন; তবে আপনার অবশ্যই আফসোস হবে যে, যতটুকু সফলতা এসেছে, এরচে ঢের বেশি সফলতা আসতে পারতো।

অর্থাৎ, একজন লোক এসে বলল আমি ৫০ কিলো তুললাম। এটা তো একটা অর্জন, সফলতা। কিন্তু আপনি যখন তাকে পরীক্ষা করে দেখলেন, তার বডি-মাসল নিরীক্ষণ করে দেখে বুঝলেন যে, ৫০ নয়, এ লোক তো ৩০০ কিলো তুলতে পারে অনায়াসে। তখন তো আপনার মনটা এমনিই ছোট হয়ে যাবে, আপনি সে লোকটাকে সম্মানের চোখে দেখতে পারবেন না তখন। পক্ষান্তরে যখন দুর্বল কেউ এসে বলবে, আমি ৫০ কিলো তুলেছি। আপনি তার দিকে তাকালেন। দেখলেন যে, সর্বসাকুল্যে লোকটা ১০ কিলো তুলতে পারে, সেখানে লোকটা ৫০ কিলো তুলেছে। তখন আপনি তাকে মাশাআল্লাহ বলে বাহবাহ দিতে পারেন, তার প্রতি মুগ্ধ হতে পারেন।

আরবরা আফগানের ময়দান থেকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যাপারে যতটুকু নেয়া সম্ভব ছিল, তার মাত্র ৫% নিয়েছে।...

আলোচনায় ফিরে যাই। গেরিলা যুদ্ধ বিশৃঙ্খল কোনো কিছু নয়। এটাতে একটা বিশেষ শৃঙ্খলা রয়েছে। রয়েছে বিশেষ গঠণ-প্রকৃতি। সাধারণ সামরিক অঙ্গনের সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে, সাধারণ সামরিক একাডেমিতে যে কার্যবিবরণী আছে, গেরিলা প্রশিক্ষণে তার পুরোটা হুবুহু অনুসরণ করা হয় না।

সাধারণ সামরিকতা : যদি আপনি সামরিক বিষয়াদি নিয়ে পড়েন, তবে দেখতে পাবেন যে, সাধারণ সৈন্যদের অনেক রীতি-প্রণালি ও নিয়ম-কানুন আছে। প্রত্যহ এসব কিছু পূরণ করা ছাড়া আপনি নড়তেও পারবেন না। আমি জর্দান সেনাবাহিনীর অনেক বইপত্র পড়েছি। এসব কর্মতালিকা-কার্যবিবরণী পড়ার সময় আপনি অনুধাবন করতে পারবেন যে, একজন সেনা নড়ারও সময় পায় না। যেমন, ৩০০ সৈন্যের একটা ব্যাটালিয়ানকে স্থানান্তরের আদেশ দেওয়া হবে, তখন কম্বল ও জুতো প্রস্তুত করে চলতে থাকতে হবে, জরুরী পানি ও খাবার খুঁজতে হবে এবং ঘুমানো ও গোসলের সময়ও আপনাকে পড়তে হবে।

তারা নিজদের উপর একটা লম্বা কার্যবিবরণীতে অবধারিত করে রাখে। এগুলো ছাড়া অন্য কিছু করতেও সমর্থ্য হয় না তারা।

এভাবে এসব কার্যবিবরণীর মাধ্যমে তারা নিজদের যুদ্ধকে, যে যুদ্ধ তারা করে, সে যুদ্ধকে তারা পঠিত ও স্বাভাবিক রীতির যুদ্ধে পরিণত করে|

গেরিলারা যেহেতু অন্য ধরণ অনুসরণ করে যুদ্ধ করে, তাই সাধারণ সামরিক কার্যবিবরণী অনুসরণ না করার কারণে, গেরিলা যুদ্ধকে غير النظامية বিশেষণে আখ্যায়িত করা হয়| কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, গেরিলা যুদ্ধ কোনো বিশৃঙ্খল, যাযাবার ধরণের যুদ্ধ কৌশল|

দুঃখজনক হলেও গেরিলা যুদ্ধ নিয়ে এ ভুল ধারণাটা অনেক যুবকের মাথায় শিকড় গেড়ে নিয়েছে, যদিও এসকল যুবক এখানে আফগানিস্থানে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা পেয়েছে| আমরা যুবকরা এখানে বিশৃঙ্খল হয়ে প্রশিক্ষণ নিই| ফলে কিছু মানুষ আফগান থেকে বের হয় সমস্যায় রূপে নিয়ে| এরপর বিশ্বের যে দেশে জিহাদের কাজ অগ্রসর হচ্ছে, সেখানে এ সমস্যা নিয়ে চলে যায়| যুবকদের কেউ কেউ এখানে এক ধরণের স্বাধীনতার চর্চা করে, চর্চা করে একধরণের দায়িত্বহীনতার|

মোটকথা, প্রশিক্ষণের দায়িত্ব প্রাপ্ত মানুষগুলো যুবকদের নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে| যুবকরা যে একধরণের

স্বাধীনতার চর্চা করে, তাদের প্রশিক্ষক সে বেপরোয়াতাকে দমন করতে সক্ষম নয়। প্রশিক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্তগণ এক জায়গায় সুস্থির থাকা ভাইদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করতে পারে। কিন্তু যারা আসে তারা তো যখন ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা এখান থেকে ওখানে স্থানান্তর হতে থাকে। তাহলে কীভাবে সম্ভব হবে? উদাহরণত একটা উন্মুক্ত ফ্রন্টে ৫০জন ভাই প্রবেশ করেন। এরপর তাদের মধ্য থেকে ২০ জন চলে যান। এরপর অন্য ৩০জন এসে প্রবেশ করেন। আর ১০জন চলে যান। এটা বিশৃঙ্খলার একটা দিক।

তেমনিভাবে আপনি যদি আমাদের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলো দেখেন, তবে লক্ষ করবেন যে, অধিকাংশ প্রশিক্ষণ শিবিরই বিনোদন স্থল যেন। অর্থাৎ সে প্রশিক্ষণ শিবিরকে *সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির* না বলে *পার্যটনিক প্রশিক্ষণ শিবির* বলাই শ্রেয় হবে। প্রশিক্ষণ শিবিরের অনিবার্য গুণ হচ্ছে, প্রশিক্ষণ শেষে সমরিকরূপে যোগ্যরা বের হবে এখান থেকে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হচ্ছে, আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সফলতার উপাদান সরবার করতে পারছি না। আফগান থেকে যে সকল মানুষ বের হয়ে যাচ্ছে -আলস্নাহ যাদের উপর রহম করেছেন, তারা ব্যতীত- সবাই অযোগ্য হয়ে বের হচ্ছে।

আমি শাইখ আব্দুলস্নাহ আযযামের সাথে ছিলাম। আমি তাকে বললাম, ‘একজন আরব মুজাহিদের এখানে নাম হচ্ছে, ভবঘুরে মুজাহিদ, যে নিজের ইচ্ছে মতো চলে।’ যখন তার ইচ্ছে, তখন আসে। আবার যখন ইচ্ছে চলে যায়। যখন ইচ্ছে ফ্রন্টে আসে। যখন ইচ্ছে অস্ত্র ব্যবহার করে। যেমনটা আগে আমরা বলে এসেছি। দুঃখের কথা, এ পরিস্থিতি তাকফীর পর্যন্ত্ম পৌঁছে যায়। কেউ কেউ নিজের ইচ্ছে মতো যাকে-তাকে তাকফীর করেছে, এমনও হয়েছে। এমনকি একজন তো শাইখ আব্দুলস্নাহ আযযাম ও আবু আব্দুলস্নাহ বিন লাদেনকেও তাকফীর করে বসে। বিশৃঙ্খলা চিন্ত্মাগত সমস্যা থেকে সামরিক সমস্যা পর্যন্ত্ম প্রসারিত হয়ে যায়।

এ নেতিবাচক বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমি বলবো, এখানে আফগানিস্ত্মানে যুবকরা যে বিশৃঙ্খলার চর্চা করেছেএ থেকে আমাদের শিড়্গা নিতে হবে। আমাদেরকে এ ব্যাপারটি পরিবর্তন করতে হবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের আশপাশের অবস্থা পরিবর্তন করতে হবে। প্রত্যেকে নিজকে দিয়ে শুরম্ন করবেন। এরপর যতটুকু দায়িত্বের আওয়তায়, মাসউলিয়্যাতের আওতায় পড়ে; ততটুকু পরিধিতিতে পরিস্থিতির পরিবর্তন করবেন। আমরা এসব মূল্যবোধ যুবকদের মস্তিষ্কে বপণ করে দেবো। কারণ

প্রকৃতপড়্ো আমরা এখানে মেহমান| কিছু দিন এখানে আছি| এরপর আমরা একটা সময় ছড়িয়ে পড়বো| একেক জন একেক জায়গায় যাবেন| যদি আমরা ময়দানে কোনো রোগের সাথে বাস করে, সে রোগ নিয়ে এখান থেকে যাই| তবে আমাদের অবস্থা হবে সে রোগীর মতো যে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে অন্য স্থানে গিয়ে অন্যদের মাঝেও একই রোগের বিস্তার করে থাকে|

নোট পয়েন্ট: **সামরিক বিশৃঙ্খলা যেমনটা আফগানের ময়দানে আমাদের জিহাদে অংশগ্রহণের সময় হয়েছে, এটা الحرب غير النظامية নয়| কারো কারো মনে এ বিষয়ে ভুল ধারণা থাকতে পারে| সঠিক ধারণাটি হচ্ছে, الحرب غير النظامية এর অর্থ হচ্ছে, এমন একটা যুদ্ধ যেটা সুনির্দিষ্ট লিপিবদ্ধ একাডেমিক নিয়মকানুন মেনে চলে না| যেমনটা সাধারণ সেনাবাহিনী একাডেমিক নিয়মকানুন মেনে চলে তাদের যুদ্ধ করার সময়| গেরিলা যুদ্ধ এমন এক ধরণের সামরিক চর্চা, যেটা ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে, উন্নত হয়েছে| এ শাস্ত্রের মৌলিক কাঠামো রয়েছে| রয়েছে বিবিধ রীতি-পদ্ধতি| রয়েছে বিবিধ পরিস্থিতি ও বিস্তারিত বিশেস্নষণ| জেনে নিতে হবে যে, জিহাদ ফি সাবিলিলস্নাহর দৃঢ় সঙ্কল্পকারীদেরও এ দুর্বলতার পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেরিলা যুদ্ধকে ভালভাবে আয়ত্ত করতে**

হবে, সুদড়্গা হতে হবে এবং যথোপযুক্ত রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী, অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী সামনে এগিয়ে গিয়ে এ বিষয়ের ক্রমন্নোতি করতে হবে। বরং মুজাহিদদের প্রাথমিক দায়িত্ব-কর্তব্য হবে, বিশেষ করে জিহাদী গেরিলা যুদ্ধের নেতৃবৃন্দের উপর আবশ্যক হবে অন্য গেরিলা যোদ্ধাদের অভিজ্ঞতা বিষয়ে জানা। যেমনটা মানব ইতিহাসে গত হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিক সময়েও গত হয়েছে। সাধারণ আকারে মানব-অভিজ্ঞতা জেনে তা থেকে উপকার নিতে হবে। সংড়্গেপে বললে, জিহাদী গেরিলা যুদ্ধের ক্রমবিকাশধারী মৌলনীতি, নিয়ম-কানুন, রীতি-পদ্ধতি রয়েছে। রয়েছে বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিশেষ আকার ও গঠন। জিহাদী গেরিলা যুদ্ধ মানে এটা নয় যে, যাযাবরের মতো হামলা করা অথবা লাল ভারতীয়র মতো যুদ্ধ করা। ভাইদের কর্তব্য হচ্ছে বর্ণিত বর্ণনানুযায়ী কার্যসম্পাদন করা।

মাও সে তুং ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে ওঁৎ পেতে থেকেছে ও আক্রমণ করেছে। রাতের বেলা ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করা। আবার ফজর হতে না হতে এ ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে সরে আসা। এটা বিশৃঙ্খল কোনো যুদ্ধ দ্বারা সম্ভব ছিল না। বরং মাও সে তুং গেরিলা যুদ্ধের নিয়মকানুন প্রয়োগ করতেন এ যোদ্ধাদের

উপর| আর সে নিয়মকানুনের সর্বাগ্রে আছে যে, তিনি এক জায়গায় সৈন্যদের ঘাঁটি গড়তেন না| শত্রম্নর সাথে সরাসরি সংঘাতেও যেতেন না| বরং আক্রমণ করে পরড়্গাণেই পালিয়ে যেতেন| চিন্তা করে দেখুন, কোনো শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন ছাড়াই কি ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা সম্ভব?

মুজাহিদ আব্দুল করীম খাত্তাবী রহ. একই পদ্ধতি ও রীতি চর্চা করেছেন| তিনি যুদ্ধের ড়্গেত্রে خفيفة الحركة তথা ড়্গিপ্র আক্রমণের নীতি অবলম্বন করেছেন| কখনও কখনও গেরিলা যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় ট্যাংকও ব্যবহার করেছেন| যদিও ট্যাংক হচ্ছে আদতে সাধারণ সেনাবাহিনীর অস্ত্র| কিন্তু এসব অস্ত্র ব্যবহার সত্ত্বেও গেরিলা যোদ্ধাগণ মূলনীতি ঠিক রেখেছেন যে, ড়্গিপ্র গতিতে আক্রমণ করে, আবার পালিয়ে গেছেন, কোথাও একত্রে সুসংহত হয়ে ঘাঁটি গড়তেন না|

এসব উদাহরণ আমরা এটা স্প ষ্ট করার জন্য উলেস্নখ করলাম যে, গেরিলা যুদ্ধের অর্থ বিশৃঙ্খল যুদ্ধ নয়| গেরিলা যুদ্ধের অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেকেই নিজের মতো করে যা ইচ্ছে তা করতে পারে| বরং গেরিলা যুদ্ধের মৌলিক নীতিমালা আছে, নিয়ম-কানুন আছে|

তৃতীয় পয়েন্ট: গেরিলা যুদ্ধ এক দীর্ঘ লড়াইয়ের নাম৷ স্বল্প সময়ে মীমাংসিত হওয়ার মতো কোনো যুদ্ধ নয় এটি৷

এখন আমরা তৃতীয় পয়েন্টের আলোচনায় প্রবেশ করছি৷ নোট পয়েন্ট: **গেরিলা যুদ্ধের তৃতীয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গেরিলা যুদ্ধ এক দীর্ঘ লড়াইয়ের নাম৷ এ যুদ্ধ এমন নয় যে, একটা বাহিনী নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি হলাম আর যুদ্ধ করে একটা পরিণতিতে পৌঁছে গেলাম৷**

গেরিলা যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈশিষ্ট্য এটি৷ গেরিলা যুদ্ধে অনায়াস সমাপ্তি নেই৷ শত্রু ও গেরিলাদের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের লড়াই এটি৷ অর্থাৎ গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে লম্বা সময়ের অপারেশন, কার্যক্রম ও ট্যাকটিক্স-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে আপনি শত্রুকে পরাজিত করার সুযোগটি প্রস্তুত করবেন৷ যদি আফগানের মানুষেরা তাদের কার্যক্রমে সুদৃঢ় হয়, তবে কাবুল সরাসরি বিজয় না করেই নাজিবুল্লাহর সরকারের পতন

ঘটানো সম্ভব। কাবুল বিজয় করা ছাড়াই তারা কাবুলে অধিষ্ঠিত সরকারকে বড় বড় ড়্গাতির মাধ্যমে পতন ঘটাতে পারে। এভাবে এ ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে সরকার তার অস্তিত্বের উপাদান হারাতে থাকবে। তাদের কাছে কোনো সাহায্য আসবে না, কাবুলে কোনো খাদ্য ঢুকবে না, কোনো মানুষও সেখানে ফিরে যাবে না, অধিক বোমা হামলার কারণে মানুষে সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে। তখন নজীব নিজকে এমন অবস্থায় পাবে যে, সে অবস্থায় রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙে পড়েছে। তখন আর এমনটা প্রয়োজন হবে না যে, কম্যুনিস্টদের এক লাইনে দাঁড় করিয়ে, মুজাহিদদের আরেক লাইনে দাঁড় করে মুজাহিদরা কম্যুর্স্টিদের পরাজিত করতে চেষ্টা চালাবে আর বিজয়ী হবে এমনটা করার প্রয়োজন হবে না। গেরিলা যুদ্ধে এমনটা হয়ও না। حرب المستضعفين কিতাবে লেখক ভিয়েতনামীদের কথা এনেছে। সেখানে গেরিলা যোদ্ধাদের একটা উক্তি উলেস্নখ করেছে যে, **‘গেরিলা যোদ্ধা ও নিয়মিত সৈন্যের মধ্যকার লড়াইটা কুকুর ও মাছির মধ্যকার লড়াইয়ের মতো।’**[১৬]

---

[16] البرغوث k‡ãi A_© KzKzi-gvwQ| KzKzi-gvwQ cvLvwenxb GK cÖKvi KxU| Bs‡iwR‡Z G‡K ejv nq, Dog Flea.

এ কীট কুকুরের তুলনায় খুবই ছোট| যদি কোনো কুকুরের সামনে এমন হাজারটা কীটও একত্রিত থাকে, তবুও কুকুর এক মুহূর্তে একদল কীটকে শেষ করে দিতে পারে| কিন্তু আসলে এমনটা হয় না| আদতে এ প্রকার মাছি কুকুরের সারা শরীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে| একটা এখানে কামড় দেয় তো আরেকটা অন্য জায়গায় কামড় বসায়| এভাবে একসময় কুকুরকে মৃত্যু পর্যন্ত নিয়ে যায়| কখনও কখনও কুকুর কামড়ের হাত থেকে বাঁচতে নদীতে লাফ দেয়| ফলে কখনও কুকুরটা পানি থেকে বেরোতে পারে, আবার কখনও পারে না| যাই হোক, কুকুর নদীতে লাফ দেয় কামড়ের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য| আবার কখনও বুদ্ধিমানের মতো একটা কৌশল অবলম্বন করে| কুকুর তার মাথা ডুবায় পানিতে, এরপর তার শরীর ডুবিয়ে মাথা বের করে নেয় অন্য দিক দিয়ে| এভাবে অল্প অল্প করে তার শরীর থেকে এ মাছিগুলোকে সরিয়ে দেয়| এভাবে শেষ পর্যন্ত লেজ পর্যন্ত ডুবে গোসল করে মাছি থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করে| আপনি দেখবেন মাছির অত্যধিক কামড়ের ফলে ককুর হিস্টোরিয়ায় আক্রান্ত হয়| কখনও কখনও কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মরেও যায়| এভাবে একটা কুকুর একদল

মাছির সামনে নাজেহাল হয়ে যায়| যদিও এরকম এক মিলিয়ন মাছির চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে থাকে একটা কুকুর|

একই কৌশল ব্যবহার করে গেরিলারা নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিরম্নদ্ধে| সরকারী সেনাবাহিনী ও সরকারী ব্যবস্থাপনার কিছু দায়িত্ব থাকে পররাষ্ট্র বিষয়ক| কিছু দূতাবাস থাকে, প্রবাসী থাকে, রাস্থা, সেতু, পারাপারের ব্রিজ থাকে| থাকে একটা ইমেজ| এভাবে এমন কিছু বিষয় থাকে, না চাইলেও যেগুলো মেইন্টেইন করতে হয় তাদের|

কিন্তু যদি গেরিলাদের একলা একটা লোক এসে ইংল্যান্ডের দূতাবাসের সামনে বোমা রেখে যায়, তবে ৩/৪ দিনের জন্য রাষ্ট্রপড়্গা জটিলতায় পড়ে যাবে| রাষ্ট্রপড়্গা কৈফিয়ত দিতে হবে, ড়্গমা চাইতে হবে| আর এসব জটিলতা একা একজন লোকই সৃষ্টি করতে পারে পুরো রাষ্ট্রপড়্গের সামনে| এ একজন লোকের শক্তি পুরো রাষ্ট্রপড়্গের সামনে কিছুই না| কিন্তু একজন গেরিলাই পুরো রাষ্ট্রপড়্গাকে অনেক জটিলতায় ফেলে দিতে পারে|

একটা বিষয় লড়্গা করম্নন| খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকারা লম্বা সময়ের ধর্ম প্রচারের কাজ নিয়ে আফ্রিকায় অবস্থানরত| অনেক ইসলামী

দেশেই তারা কাজ করে যাচ্ছে খ্রিস্টধর্মের পড়্োা। এ বিষয়টি একটি স্বতন্ত্র বিষয়। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটা আলোচনা প্রয়োজন। তো, এ খ্রিস্টান মিশনারীগণ গত ২৫ বছরে ইন্দোনেশিয়ার ২০ মিলিয়ন মুসলিমকে খ্রিস্টান বানিয়েছে। চিন্ত্মা করে দেখুন, ইন্দোনেশিয়ায় যে ২০ মিলিয়ন মুসলিমকে তারা খ্রিস্টান বানিয়েছে, এরা মুসলিমদের সন্ত্মান হয়েও মুসলিমদের বিরম্নদ্ধে যুদ্ধ করবে। গত বছর বিশ্ব গীর্জার প্রধান ছিল কার্টার। তারা পুরো কালো আফ্রিকাকে ২৫ বছরের ভেতরে খ্রিস্টান বানানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ ২৫ বছরের মধ্যে পুরো আফ্রিকা, চাই সেটা আরবী দেশ হোক বা উত্তর আফ্রিকার কোনো দেশই হোক, পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা এ পুরো অঞ্চলকে খ্রিস্টান বানিয়ে ছাড়বে।

এ মিশনারীরা গ্রম্নপ করে করে চলা ফেরা করে। গাড়িতে করে আসা-যাওয়া করে। তাদের গীর্জা রয়েছে। একবার চিন্ত্মা করে দেখুন, যদি তাদের উপর গেরিলারা হামলা করে, তবে বিষয়টা কেমন দাঁড়াবে? যদি তাদের মধ্যকার একজন মিশনারীকেও হত্যা করা হয়, তবে একজনের হত্যার পর ৫ হাজার মিশনারী পালিয়ে যাবে।

খ্রিস্টান মিশনারী আফ্রিকায় এসেছে, কারণ তারা আফ্রিকাকে নিরাপদ মনে করছে। কিছু সহজ কৌশল ও পদ্ধতি আছে, যদি তা সঠিকভাবে আপনি প্রয়োগ করতে পারেন, তবে খ্রিস্টান মিশনারীদের এ অনায়াস আগমনের ধারা বন্ধ হয়ে যাবে।

চিন্তা করে দেখুন, একটা সেনাদল গরমে পানি ও শীতে আগুনের উপর নির্ভর করে থাকে। আর গেরিলা বাহিনী যদি গোপনে পানি ও আগুনের উপর হামলা করে। তবে এ সেনাদলের অবস্থা কেমন ঠেকবে? গেরিলা বাহিনী কেবল জ্বালানীর ভা-ারকে নিজদের লড়্গ্যস্থল বানালে, জ্বালানী বহনকারী গাড়িকে টার্গেট করলই একটা সেনাবাহিনী পরাজিত হবে এবং পালানোর জন্য উন্মুখ হয়ে পড়বে।

গেরিলা যুদ্ধের কলা-কৌশল এগুলো। আপনারা নিজদের মস্তিষ্কে এ কথা বসিয়ে নেবেন না যে, গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে এমন একটা যুদ্ধ, যেটা অল্প কিছু সময়ের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যায়। এটা ভুল ধারণা। সিরিয়ার জিহাদের ড়্গেত্রে এমনটা হয়েছে, ফলে পুরো জিহাদ এক নিমিষে শেষ হযে গেছে। হামায় একটা ঘটনা ঘটে, যদিও এ পরিস্থিতিতে মুজাহিদদের অন্য কিছু করার ছিল না। মুজাহিদরা সেখানে কিতাল করতে বাধ্য হয়। কারণ

তাদের সামনে দুটো রাস্ত্মা ছিল| হয় কিতাল করা ছাড়াই মারা যাও অথবা কিতাল করে যতটুকু পারা যায় নিজদের প্রতিরড়্গা করো|

অনেক জায়গায় বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকায় এ ভুলটা দেখা গেছে| গেরিলা যোদ্ধারাই মীমাংসা ও চূড়ান্ত্ম যুদ্ধে চলে এসেছে| ফলে তাদের চূড়ান্ত্ম পরিণতি ঘটে গেছে| তারা যখন পাহাড়, বন ও পুরো দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিল; তারা নিয়মিত সেনাদলকে রম্নখে দিতে পারতো, বিভিন্নভাবে লড়্গ্যবস্তুতে আঘাত করে প্রতিহত করতে পারতো| যদি তারা সরাসরি সংঘাতকে এড়িয়ে চলতো, তাহলে হয়তো তারা নিজদের যুদ্ধে সফল হতে পারতো| সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে অনেক রাষ্ট্রপড়্গেরই পতন হয়েছে|

যেমনটা হয়েছে কিউবাতে| ফিদেল ক্যাস্ট্রোর[১৭] হাতে| এ কাফের এখনও জীবিত| সে এখন কিউবার রাষ্ট্রপ্রধান| অথচ যখন সে যুদ্ধ শুরম্ন করে, তখন তার সাথে মাত্র ৮ জন লোক ছিল| অবশ্য

---

[17] wd‡`j K¨v‡÷ªv wQj wKDevb Kgy¨wb÷ ˆecøweK †bZv| 1953 cKcj 1959 ch©šÍ wKDevb wecøe Pjgvb _v‡K| hvi †bZ…‡Z¡ wQj wd‡`j K¨v‡÷ªv| 1959 †_‡K 1976 ch©šÍ cÖavbgš¿x wn‡m‡e wKDev kvmb K‡i| 1976 †_‡K 2008 ch©šÍ †cÖwm‡W›U wn‡m‡e kvmb K‡i| - Abyev`K|

সে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সহায়তা পেয়েছে৷ কিন্তু যুদ্ধ তো তাকে একাই করতে হয়েছে৷ সৈনিক হবার পর থেকে সে নিজে নিজে যুদ্ধ চালিয়ে যায়, এক পর্যায়ে সে রাষ্ট্রপ্রধান হয়, এরপর হয় ডিক্টেটর; এখনও সে শাসন করছে সে দেশ৷ বাস্তবিক অর্থেই এ লোকটা ময়দানের নেতৃত্বের জন্য একটা দৃষ্টান্ত৷ সে এমন একটা দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, যার কারণে অনেক মুসলিম নেতাদের লজ্জায় ফেলে দিয়েছে৷

সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন কম্যুনিস্টদের পতন ঘটলো, তখন সে বলল, *'কিউবা হবে কম্যুনিস্টদের অভয়ারণ্য৷ যদি পৃথিবীতে একজনমাত্র কম্যুনিস্ট থাকে, তবে সে হবে ফিদেল ক্যাস্ট্রো৷'*

যখন তার সৈন্য সংখ্যা ১০০ জনে উন্নীত হয় আর রাষ্ট্রপক্ষের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০ হাজার, তখন ফিদেল বলেছিল, 'যেহেতু আমার সৈন্য সংখ্যা ১০০ তে পৌঁছলো, আমি এখন বলি, গেরিলা যোদ্ধারা এখন পরাজয়ের অনুপযুক্ত৷'

দেখুন, আলস্নাহ তাআলা বলছেন,

الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ

‘এখন আলস্নাহ তোমাদের দায়িত্বভার কমিয়ে দিয়েছেন| আলস্নাহ তো জানেন যে তোমাদের ভিতর দুর্বলতা রয়ে গেছে, কাজেই তোমাদের মাঝে যদি একশ জন ধৈর্যশীল হয় তবে তারা দুশ জন কাফেরের উপর বিজয়ী হবে|’[১৮] অর্থাৎ ২ জনের মোকাবেলায় ১ জন মুসলিম যথেষ্ট| এর আগের আয়াতগুলোতে পরিমাণটা ছিল ১০ জনের মোকাবেলায় ১জন মুসলিম|

একজন কাফের যখন বলে, ‘যেহেতু ৫০০ জন সৈন্যের মোকাবেলায় আমরা ১জন করে গেরিলা রয়েছি, সেহেতু আমাদের পরাজয় অসম্ভব|’ এরপর আসলেই সে যুদ্ধে অংশ নেয়, বিজয় হয়, নিজের লড়্যা বাস্ত্মবায়ন করে, একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে| আপনি এবার চিন্ত্মা করে দেখুন সে সব পরাজিত মানসিকতার লোকদের কথা, যারা কিছু করার আগেই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছে| এখানে দেখুন, ফিদেল ক্যাস্ট্রো আসবাব গ্রহণ করলো, রীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী চলল, সেগুলো প্রয়োগ করলো, কোরবানী দিল, এরপরই সে নিজের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলো|

---

[18] m~iv Avbdvj : 66|

অবশ্যই হিকমত মুমিনের হারানো সম্প দ| কম্যুনিস্টদের দিয়ে উদাহরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই আমাদের| আমাদের ইসলামী ইতিহাস এমন অনেক ঘটনায় ভরপুর হয়ে আছে| কিন্তু মুসলিমদের জন্য লজ্জার বিষয় যে, কাফের হয়েও ওরা রীতি-পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা পর্য˜ত্ম পৌঁছে যায়| আর আমরা যেখানে ছিলাম পরাজয়ের মাঝে আজও সেভাবেই আছি|

গেরিলা যুদ্ধ এমন কোনো যুদ্ধ নয় যা নিমিষেই মীমাংসায় পৌঁছে যায়| তাই গেরিলা বাহিনীর শক্তিকে নিয়মিত সেনাবাহিনীর শক্তির সাথে তুলনা করা, অনুপাতের হিসেব মিলানো জরম্নরী নয়| গেরিলা যুদ্ধ হচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর যুদ্ধ| এজন্য আপনার প্রয়োজন হবে একটা যোগ্য নেতৃত্ত্বের| যে নেতৃত্ব জানবে যে, কোথায় আঘাত করতে হবে, কীভাবে আঘাত করতে হবে, কীভাবে মিতব্যয়ী হয়ে পরিমিতরূপে গেরিলা বাহিনীর শক্তি ব্যয় করতে হবে, শত্রম্নকে কীভাবে অনবরত ও দ্রম্নত দংশন করতে হবে; যাতে করে রাষ্ট্রপড়্গ এমন এক অবস্থায় পৌঁছে যায়, যে অবস্থায় তাদের অস্ত্মিত্ত্ব টিকিয়ে রাখা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে|

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই একনায়কতন্ত্র বিদ্যমান। যদি কোনো রাষ্ট্রে যেমন জর্দানে শাসনকারী গোষ্ঠীকে ইস্তেশহাদী হামলায় হত্যা করে ফেলা হয়, তখন কী হবে? জর্দানে কে শাসন করবে? গেরিলাদের জন্য কি এ হামলা করা সম্ভব নয়? কিন্তু যদি গেরিলারা জোর করে আত্মপ্রকাশ করে এবং পুরো সেনাবাহিনীর সাথে সরাসরি যুদ্ধে লেগে যায়, তাহলে গেরিলারা কোনো চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না, দেশের মধ্যে রাষ্ট্রপড়োর জন্য নানান সমস্যাও সৃষ্টি করতে পারবে না। তাই আপনাকে বুঝতে হবে, মুখোমুখি সামরিক যুদ্ধ করার নাম নয় গেরিলা যুদ্ধ; বরং গেরিলা যুদ্ধ মানে হচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞ চালাবার যুদ্ধ।

চতুর্থ পয়েন্ট: গেরিলা যুদ্ধের ৩টি স্তর

নোট পয়েন্ট: **প্রত্যেক গেরিলা যুদ্ধের কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় এবং গেরিলা যুদ্ধ সফল হয় ৩টি স্তরের মধ্য দিয়ে। প্রথম স্তর হচ্ছে, দুর্বলতার সময়ের স্তর। এ সময়ে গেরিলা বাহিনী আকারে ছোট হয়ে থাকে। এ বাহিনী শত্রুর গায়ে ছোট ছোট দংশন করে। আর অতি অবশ্যই তাদের অস্ত্র-**

শস্ত্র থাকে নগণ্য পর্যায়ের। তাদের গুপ্ত হামলাও হয় সামান্য পর্যায়ের। তাদের অপারেশনও আঞ্জাম পায় ছোট ইউনিটের মাধ্যমে। ছোট ছোট বেশি বেশি দংশন করা, বেশি বেশি ছোট ছোট অপারেশন করা, আক্রমণ করা ও পালিয়ে যাওয়ার এ প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রপড়্গা-সামরিকবাহিনী (যারা সাধারণত মুখোমুখী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়) কষ্টে নিপতিত হয় এবং ক্লান্স্থ হয়ে পড়ে। তারা মানুষের উপর নিজদের নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকে। তখন গেরিলা বাহিনী বৃহদাকারে সৈন্য সংগ্রহ করতে থাকে মানুষের মধ্য থেকে এবং আগের চেয়ে বেশি করে সম্প দ আহরণ করতে থাকে। তখন তাদের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়াতে থাকে। আর তারা এসব কিছুকে ব্যবহার করে, কাজে লাগায়। পূর্বের তুলনায় গেরিলা বাহিনী তখন অধিক সড়্গম ও ড়্গমতাবান থাকে। তখন পাহাড়ে পাহাড়ে ও বিভিন্ন স্থানে গেরিলা বাহিনীর প্রশিড়্গণ শিবির থাকে। তখন গেরিলা বাহিনী এমন কিছু উপাঞ্চল, বিভিন্ন সড়ক, বিভিন্ন এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে থাকে, যেখানে সরকারী বাহিনীর অনুপস্থিতি থাকে। এভাবে রাষ্ট্রপড়্গা কিছু বড় শহর ও এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; সেগুলোতে রাষ্ট্রপড়্গের নিয়ন্ত্রণ থাকে।

এ ভাগগুলো প্রচলিত বিভক্তিকরণের পর্যায়ে পড়ে। আবশ্যক নয় যে এভাবেই হতে হবে। গেরিলা যুদ্ধের প্রথম স্তরটি হচ্ছে, مرحلة الاستنزاف তথা ক্ষয়করণের স্তর। এরপর দ্বিতীয় স্তরে আসে مرحلة التوازن তথা সমতার স্তর। এরপর তৃতীয় স্তর হচ্ছে, اكتساح الدولة তথা রাষ্ট্রপক্ষকে বহিষ্কার করার স্তর।

এ স্তরগুলোতে প্রথমেই গেরিলা বাহিনী রাষ্ট্রপক্ষের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না। এমনকি গেরিলা বাহিনীর হতে ট্যাংক, মর্টার প্রভৃতি থাকলেও না। আর গেরিলা বাহিনী একটা কাঠামোতে দাঁড়িয়ে গেলেও না। এসব কাঠামো 'প্রায় সরকারী' ভূমিকা পরিগ্রহ করে। কিন্তু তখনও গেরিলা রীতি-পদ্ধতি বিরাজমান থাকে। কিন্তু তৃতীয় স্তর, যেটা হচ্ছে সম্মুখ সমর ও মীমাংসার স্তর। এ স্তরে এসে গেরিলা বাহিনীর একটা বিরাট অংশকে নিয়মিত সেনাবাহিনীর পথে বিন্যাস করতে হয়। এবং তখনও গেরিলা বাহিনী মিলিশিয়া বাহিনী হিসেবে বিরাজমান থাকে আর মানুষজন গেরিলা বাহিনীর সমর্থনশক্তি হিসেবে থাকে।

এসব ভাগ সাধারণ বিভক্তিকরণ। এমনটাও সম্ভব যে, গেরিলা বাহিনী প্রথম স্তর পার করতে অনেক সময় নিয়ে নেবে। আবার

এমনও হতে পারে যে, গেরিলা বাহিনী প্রথম স্তরে থাকতেই হঠাৎ করেই সরকারপক্ষের পতন হয়ে যাবে। ত্রাসসৃষ্টিকারী প্রতিরোধ যুদ্ধগুলোতে এমনটা হয়েছে। যেমন সাইপ্রাস। সাইপ্রাসের প্রতিরোধযোদ্ধারা ইংরেজদের মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করেই তাদের ধ্বংসপ্রান্তে নিয়ে যায়। কোনো রকম সম্মুখ সমর ছাড়াই এটা ঘটে যায়। সাইপ্রাস-যোদ্ধারা ইংরেজদের মনে এটা গেঁথে দিতে সক্ষম হয় যে, অচিরেই ইংরেজ এদেশে খুব বিরাট আকারে ক্ষতির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে। এটা বিশ্বাস করে ইংরেজরা সাইপ্রাস থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু এমনটা হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ যুদ্ধে দ্বিতীয় স্তর সংঘটিত হয়।

তিন স্তরের এ বিভক্তিকরণ কিউবাতে দেখা গেছে স্পষ্ট আকারে। সেখানে গেরিলারা প্রথম স্তর পার করে দ্বিতীয় স্তরে পৌঁছে। এরপর তারা নিজদের সংগঠিত করে, পাহাড় থেকে নেমে আসে এবং শহরগুলো পরিষ্কার করতে থাকে রাষ্ট্রপক্ষকে বহিষ্কার করে।

একইভাবে ভিয়েতনামেও ঘটেছে স্পষ্টরূপে। ভিয়েতনামীরা বনে বনে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তারা প্রথম স্তর হয়ে দ্বিতীয় স্তর হয়ে তৃতীয় স্তরে পৌঁছায়। অবশেষে তারা নিজদের

সংগঠিত করে, বিন্যাস করে| তাদের গেরিলা বাহিনীর মাঝে জেনারেল প্রভৃতি পদ সৃষ্টি হয়| তারা একটি নিয়মিত সেনাবাহিনীতে রূপ নেয়| এরপর তারা এ বাহিনী দিয়ে শত্রম্নদের খেদিয়ে রাজধানী পরিষ্কার করতে থাকে|

আফগান গেরিলা বাহিনী এখনও তৃতীয় স্তরে রয়েছে| কারণ তারা এ স্তরের কার্য সম্পন্ন করতে অড়্গম| আমরা অধিকাংশই কারণগুলো জানি এবং বুঝি| সে কারণগুলোর মধ্যে সবচে গুরম্নত্ববহ কারণ হচ্ছে, নেতৃবৃন্দের মধ্যকার বিবেদ, আবার বিশৃঙ্খলা আফগানদের রক্তের সাথে মিশে রয়েছে| মনে হচ্ছে, এখন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটা দরকার, যার ফলে তাদের মধ্য থেকে এ দোষটা চলে যাবে|

কাবুল বিজয়ের সময় সামরিক পরিষদের পরামর্শদাতা এক ভাই আমাকে বলেছিলেন যে, ‘একটা সভা ছিল| আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম| আমার সাথে কিছু কাগজ ছিল| আমি সভায় বললাম, “ভাইয়েরা, আমরা এখন গেরিলা যুদ্ধের তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি| তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজদের সুসংগঠিত করা| এখন প্রত্যেক তানজীমের কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের সামনে সামরিক অফিসার ও ক্যাডারদের গ্রম্নপ

উপস্থিত করা| যাতে আমরা তাদের সংগঠিত করতে পারি| আমরা তাদের সকলকে ব্যাটালিয়ানে রূপ দেবো| আরবরাও সংগঠিত ব্যাটালিয়ানে রূপ নেবে|" আমার কথা শেষ হলে, বড় এক তানজীমের সামরিক দায়িত্বশীল বললেন, "ভাই আমার, আমরা এমন জাতি, যাদেরকে আলস্নাহ বিশৃঙ্খল থাকার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন|"'

সে সভা আলোচনা করার আগেই শেষ হয়ে গেল| অর্থাৎ তারা বলেছিলেন, ভাই আমার আলস্নাহ তাআলা আমাদের এ বিশৃঙ্খল হওয়ার নেয়ামত দিয়ে সাহায্য করেছেন| আর তুমি যাচ্ছো আমাদের থেকে সেটা কেড়ে নিতে! আমাকে সে ভাইটি আরো বলেন, 'এরপর আমি আমার কাগজগুলো একত্র করে নিলাম, যে কাগজগুলোতে আমি তাদের জন্য বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজিক্যাল, টেকনোলোজিকাল বিষয়াদি এবং সংশিস্নষ্ট বিবিধ বিষয় লিখে এনেছিলাম| এরপর আমরা তাদের সাথে বসে চা পান করে বেরিয়ে এলাম|'

বিশৃঙ্খলার সে প্রভাব এবং এ মানসিকতা আফগানদের মাঝে বিরাজমান| তারা এখনও সে কারামতের মুখাপেক্ষী, যে

কারমাত এসে তাদেরকে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে।

দুনিয়া নামক দারুল আসবাবে কিছু নিয়ম-কানুন, কিছু রীতি-পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। আমরা এখনও সে দারুল আসবাবেই আছি। দারুল ইবাদতে বিদ্যমান আছি।

আফগানরা এখনও দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মাঝখানে। যদিও আফগানে গেরিলা বাহিনী দ্বিতীয় স্তর শুরু করেছে ৪ বছরেরও বেশি সময় আগে, যখন তারা আফগানের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। যেমনটা তারা এখনও তাদের বিবিধ প্রকাশনায় বলে থাকে, 'আফগানিস্তানের ৯৫% আমাদের নিয়ন্ত্রণে।' আফগানরা আফগানিস্তানের ৯৫% মাটি দখল করে আছে। কিন্তু সকল বড় বড় শহর, শহরগুলোর মাঝে সংযোগকারী সড়কগুলো, পেট্রলের অঞ্চল, খনির এলাকাগুলো, সম্পদের এলাকাগুলোতে এখনও কম্যুনিস্ট সরকার কব্জা করে আছে। যেন কম্যুনিস্ট সরকার বলছে, 'তোমরা যদি পাহাড়, বন-বাদাড়, বোমা-বারুদে পুড়ে যাওয়া জায়গাগুলো চাও, তবে সেগুলো নিয় নাও।' এখন আফগান গেরিলা বাহিনী বসে আছে।

দ্বিতীয় স্তর ছেড়ে তৃতীয় স্তরে পাড়ি জমাতে এবং রাষ্ট্রপড়্গাকে বহিষ্কার করতে অড়্গাম হয়ে আছে|

ভাইরা আমার, আপনারা বুঝেছেন যে, গেরিলা রণনীতি একটা বিশেষ শাস্ত্রের নাম| এটা বিশৃঙ্খল কিছু নয়| এখানে পরিকল্পনা করা প্রয়োজন| গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রয়োজন| সম্ভবত পুরো আফগানের মধ্যে সংগঠিত রূপে এবং সঠিক ট্যাকটিক্স ও কৌশল অনুযায়ী যে ব্যক্তি গেরিলা যুদ্ধ চর্চা করেছে, সে হচ্ছে আহমাদ শাহ মাসউদ| তার ব্যাপারে যা কিছু শোনা যাচ্ছে, সেগুলোর প্রতি একটা দৃষ্টি দিয়ে এমনটাই মন্তব্য আসে| লোকটার ব্যাপারে বিবিধ বর্ণনা এসেছে| কিছু নেতিবাচক, কিছু ইতিবাচক| কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে তার যোগ্যতা রয়েছে, রয়েছে কিছু কীর্তি| এমনকি একবার আমি শুনেছি, সে নাকি ৫ বছরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে| একইভাবে, বিভিন্ন খনি কাজে লাগিয়ে তার উৎপাদন বিক্রি করে নিজের আর্থিক যোগান ঘটাচ্ছে| অন্যদিকে অন্যরা মুজাহিদদের অভাব-অনটনের নিয়মের ভেতরে রয়ে গেছে এখনও| পড়্গান্তরে এ লোকটা নিজের কার্যক্রম গুছিয়ে নিচ্ছে|

এ বিষয়গুলো গোপন থাকার নয়। আমি মনে করি, যে মানুষটি জিহাদ করার স্তরে পৌঁছে গেছে, যে তার রক্তকে আলস্নাহর রাস্তায় ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়েছে; আমাদের উচিত তার বুদ্ধি ও আকলের সম্মান করা, তাকে সঠিক তথ্য প্রদান করা। পরিস্থিতির আসল রূপটা তার সামনে উন্মোচন করা। যাতে করে তার নিয়ত সংরক্ষিত হয়। তার দৃঢ়তা ও সংহতি অটুট থাকে। কিছু দোষ-ত্রম্নটি থাকা সত্ত্বেও আমরা এখনও আফগানদের সাথী হয়ে লড়ে যেতে চাই। কারণ অনেক মাকাসিদে শরীয়া, মাসালিহে এখানে এ জিহাদে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের এখান থেকে শিক্ষা নিতে হবে। আমি আবারো পুনারাবৃত্তি করছি যে, আমরা এখানে মেহমান। সে সময় নিকটবর্তী, যখন আমাদের পৃথিবীর অন্য কোনো জায়গা থেকে ডাক পড়বে, ইনশাআলস্নাহ, তখন আমরা সে ডাকে সাড়া দেবো। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, এখানকার দোষত্রম্নটি যেন আমরা অন্য ফ্রন্টে নিয়ে না যাই। যেখানেই যাবো আমরা, সেখানে সঠিক পদ্ধতি ও রীতি নিয়ে যাবো।

সংযুক্তি

১. তানজীমের ৫ উপাদান, আলেমদের প্রকারভেদ ও তাকফীরের প্রতিবন্ধকতার আলোচনা

[প্রথম পর্বের শুরম্নতে দাওরার আলোচনা শুরম্ন করার আগেই কিছু কথা বলেছিলেন শাইখ আবু মুসআব। কথাগুলো কোর্স সংশিস্নষ্ট নয় বিধায় আমরা সে কথাগুলো সংযুক্তি আকারে এখানে যুক্ত করছি।]

...যদি আলজেরিয়ায় কাজ চালায় এমন কোনো তানজীম থাকে অথবা একটা অঞ্চলে কাজ করে এমন কোনো তানজীম থাকে কিংবা অন্য কোথাও এমন থাকে, তবে তাদেরকে সে শহর ও অঞ্চলের পরিস্থিতি সংশিস্নষ্ট কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে।

দুই নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে, নেতৃত্ব। আমরা বলি, নেতৃত্ব গঠিত হয় আমীর, নেতৃত্ব পর্যায়ের সদস্যগণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি শূরা এগুলোর মাধ্যমে। অর্থাৎ একজন আমীর, নেতা, গোত্র প্রধান হলেই নেতৃত্বের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং একজন পরিচালক

থাকবেন| যাকে আমীর, খলীফা, সুলতানপরিস্থিতি বিবেচনায় যে কোনো একটা নামে ডাকা হবে| এবং তার সাথে আমীরের বিশেষ কতক সঙ্গী থাকবেন, যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আমীরকে পরামর্শ দিয়ে বাহিনী পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করবেন|

পরামর্শ গ্রহণের একটি পথ আছে| যকে আমরা বলি শূরা| শূরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর মতে একেবারে চূড়ান্ত বাধ্যতামূলক কিছু নয়| যদিও জামহুরের মতে শূরা মুস্তাহাব| আবার কতিপয় সালাফের মতো শূরা ওয়াজিব|

এখানে আমলের অভিমতটা হচ্ছে, আলস্নাহই ভাল জানেন, আইমায়ে সালাফের বিশেষ রায়টি| আর তা হচ্ছে, শূরা আমীরের জন্য ওয়াজিব, তবে তার জন্য জরম্নরী নয়| বর্তমানের কঠিন সময়ে আমাদের জন্য এটাই অধিক উত্তম| কারণ অধিকাংশ আমীরগণই দ্বীনি রাজনৈতিক সামরিক জ্ঞান একই সাথে নিজের মাঝে ধারণ করেন না|

এরপর আছে, সম্প দ সংরড়্গাণ/সম্প দ প্রকল্প| তানজীমের জন্য এটা অপরিহার্য উপাদান| যদি কোনো তানজীম সম্প দের অনটনে থাকে, তবে অচিরেই অনটনের কারণে শেষ হয়ে যাবে

অথবা অন্যদের পেছনে সম্পদের জন্য লেগে থাকার কারণে শেষ হয়ে যাবে।

আমরা যেটা উলেস্নখ করেছিলাম যে, তানজীমে একটা পরিকল্পনা থাকতে হবে, স্ট্র্যাটেজী থাকতে হবে। বিষয়টা এমন হবে যে, নেতৃত্বের বিশেষ মানুষদের সবার কাছে স্পষ্ট থাকবে যে, তারা কী চায়। তাদের এটা জানা থাকবে যে, তারা কেন মানুষকে একত্রিত করছে। তাদের জানা থাকবে যে, প্রথম স্তর কী, দ্বিতীয় স্তরে কী করণীয়। তৃতীয় থেকে শেষ পর্যন্ত কী কী করণীয় সব তাদের জানা থাকবে।

এভাবে যখন মানহাজ, নেতৃত্ব, সম্পদের উৎস, পরিকল্পনা থাকবে; তখন নেতৃত্বের কর্তব্য হচ্ছে সেনা সদস্যদের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা। শোনা ও মানার নিয়মে নিয়ে আসা সেনা সদস্যদের।

এ পাঁচটি উপাদান মিলে একটা দল তানজীমে পরিণত হয়। অন্যথা একটা দল স্রেফ জিহাদী সঙ্ঘ হতে পারে। অথবা হতে পারে এমন প্রাথমিক স্তরের দল, যারা পরবর্তীতে তানজীমে রূপ নিতে পারবে না।

এরপর আমরা কথা বলেছি মানহাজ নিয়ে| কথা বলেছি মানহাজের গুরম্নত্ব নিয়ে| সাথে সাথে কিছু উদাহরণ পেশ করেছিলাম| বর্ণনা করেছিলাম যে, যে দলের মানহাজ থাকে না, পথের শুরম্নতেই অথবা পথের মাঝখানে সে দলের মানুষদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতানৈক্য শুরম্ন হয়|

আমি যেসব বিষয়ে কথা বলতে চাইছিলাম| সেগুলোর মধ্যে এ ছিল প্রথমটি| প্রথম বিষয়ে কথা শেষ| দ্বিতীয় যে বিষয়ে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে, গেরিলা রণনীতি| তৃতীয়তে কথা বলবো, একাকী জিহাদ (লোন উল্ফ) নিয়ে| যদি কোথাও দলগত জিহাদ না থাকে, তবে কীভাবে একাকী জিহাদ করতে হয়, সে বিষয়ে আলোচনা হবে শরয়ী, রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে|

- এ পর্যায়ে এক ভাই শাইখকে প্রশ্ন করেন| রেকর্ডিংয়ে কথা স্প ষ্ট নয়| তবে কথাগুলো তাকফীরের নিয়মকানুন বিষয়ে ছিল|

শাইখ বলেন,

ভাই আমাকে একটা বিষয় স্মরণ করিয়ে দিলেন| মানহাজ বিষয়ে একটা কথা উলেস্নখ করবো এখানে| জিহাদী জামাআতের উপর আবশ্যক যে, জিহাদী জামাআত আলেমদের

বিষয়ে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করে দেবে| ইসলামী কার্যক্রমের বিষয়ে নিজদের চি˜ত্মাগত অবস্থান স্প ষ্ট করে দেবে|

আমরা বলি, আলেম ৩ প্রকার:

১. মুজাহিদ আলেম| যারা জিহাদী ফিকরের উপর থাকেন| যারা আমলকারী আলেম| এ যুগে এমন আলেম বিররল| কিন্তু তারা স্বমহিমায় উজ্জ্বল| যেমন আব্দুলস্নাহ আযযাম ও অন্য আমলদার মুজাহিদ আলেমগণ|

২. স্বতন্ত্র আলেমগণ| এমন আলেমগণ সরকার-হুকুমতের অধীন থাকেন না| যেমন, শাইখ আলবানী| এ শ্রেণীর আলেমরা ভুল করম্নন আর সঠিক করম্নন, সেটা তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান|

আমরা এখানে বলি, এ ধরণের স্বতন্ত্র আলেমগণের সাথে আমাদের সম্প র্ক বিদ্যমান থাকবে| যেমনটা ইমাম মালিক রহ. বলেন, 'প্রত্যেকেরই কিছু কথা গ্রহণযোগ্য, কিছু কথা প্রত্যাখাত|' তেমনি এ শ্রেনীর আলেমদের থেকে আমরা সে ইলম নেবো, যে ইলমে তারা বিশেষজ্ঞ| যেমন শাইখ আলবানী| আমারা তার কাছ থেকে ইলমুল হাদীস গ্রহণ করতে পারি| তিনি এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ| কিন্তু সিয়াসাতুশ শরইয়্যাহ বিষয়ে তিনি

যখন কথা বলবেন; তখন তার কিছু কথা ভুল হবে, কিছু শুদ্ধ হবে| তাই আমরা এমন বিষয়ে তার কাছ থেকে ইলম নেবো না, যে বিষয়ে তিনি সাধারণ কেউ, যে বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ না| এড়্োত্রে আমাদের কর্মের মূলনীতি হবে, আমরা কাউকে এমনভাবে অনুসরণ করবো না, যেটা আহবার ও রাহেবের ইবাদত করার মতো হয়ে যায়|

৩. দরবারী আলেম| বর্তমানে প্রত্যেক সুলতান, প্রত্যেক সরকার, প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী এক গ্রম্নপ আলেম দিয়ে বেষ্টিত রাখেন নিজদের| যখন কোনো আলেমের মাঝে ৩টি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে, তখন আমরা তাকে দরবারী আলেম বলে আখ্যায়িত করতে পারি| বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে,

ক. যখন কোনো আলেম সরকারী চাকুরী করে| যে পদে সে আলেম বজায় থাকে, তার বিনিময়ে বেতন নিয়ে থাকে|

খ. অকাট্য কাফেরের মাঝে কুফরী দেখেও যদি তাকে মুসলিম বলে| যেমন, একজন বিচারক, আলস্নাহর বিধান অনুযায়ী বিচার করে না এবং কুফরীর শর্ত পাওয়া যায় তার মাঝে; তবে তার কুফর স্প ষ্ট| কিন্তু সে আলেম এরকম কাফেরকে মুমিন মুসলিম বলবে|

গ. তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ ধরণের আলেম সে সব মানুষকে বিদ্রোহী, খারেজী, অপরাধী, কাফের, গোমরাহ ইত্যাদি বলবে, যে সব মানুষ কাফের সরকারের বিরূদ্ধে লড়াইয়ে যুক্ত হবে|...অর্থাৎ এ ধরণের আলেম কাফেরদের পড়ো সাড়্যা দেবে যে, هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (মুমিনগণের তুলনায় অধিক সঠিক পথে রয়েছে|)[১৯]

যখন এসব বৈশিষ্ট্য কোনো আলেমের মাঝে পাওয়া যাবে, তবে তিনি দরবারী আলেম| এমন আলেমের সংখ্যা অনেক| আমরা কিছু উদাহরণ পেশ করছি| সিরিয়ায় বুতী-র মতো আলেমগণ| মিসরের আজহারের অনেক আলেম| আমরা বলছি, এ সব আলেম ‘মুরতাদ আলেম শ্রেণী’ হওয়ার নিকটে পৌঁছে গেছেন| ভাইটির প্রশ্ন ছিল, *আমরা কী দরবারী আলেমের শর্ত পাওয়ার পর তাড়াহুড়ো করে সে আলেমকে ‘মুরতাদ আলেম’ বলে দেবো?* যেমন, কেউ প্রস্তুত হলো এমনটা করতে, ইবনে বাজের মাঝে দরবারী আলেম হওয়ার শর্ত পাওয়া গেছে, তবে কি আমরা তাকে মুরতাদ বা কফের বলে দেবো? এমন কথা বলে দেওয়া অবশ্যই ত্বরাপ্রবণতা| এটা দ্রূততাপ্রবণতা| কারণ এসব

---

[19] m~iv wbmv : 51|

ইলমী বিষয়| এখানে অনেক শর্ত পূরণ হওয়ার বিষয়ে যাচাই-বাছাই করার আছে| এখানে এ বিষয়টি জেনে রাখতে হবে সবাইকে -বিশেষ করে তাদেরকে যারা আগের আলোচনাটি শুনেছেন-| যেন কেউ তাড়াহুড়ো করে কোনো ভুলের মধ্যে পড়ে না যায়|

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইজমা রয়েছে যে, কোনো মানুষ যদি রিদ্দাহর কাজ করে, তবে প্রথমে আমরা তার ড়্গেত্রে বলবো যে, ‘এ মানুষটি রিদ্দার কাজ করেছে|’ আমরা তাকে মুরতাদ বলে দেবো না| কারণ তাকফীরের ড়্গেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর কিছু মূলনীতি আছে, তাকফীরের ড়্গেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতাও আছে| তাকফীরের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো সংড়্গেপে ৪টি|

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামআহর মতে, কোনো মানুষ কুফরী কাজ করলে, তাকে তাকফীর করা যায় না যদি তার মাঝে চারটি ওজর থাকে| চারটি ওজরের চারটিই থাকতে হবে, বিষয়টা এমন নয়| বরং চারটি ওজরে যে কোনো একটি থাকলে সে মানুষটি আইনী কাফের হবে না এবং তাকে তাকফীর করা থেকে বিরত থাকতে হবে| বরং বলা হবে যে, সে একটা কুফরী

কাজ করেছে। যেমনি আমরা কারো মাঝে নিফাকের একটা আলামত দেখলে সেটা ছাড়া পর্যন্ত বলি যে, তার মাঝে নিফাকের একটা আলামত রয়েছে। একজন মুমিনের মাঝে একই সময়ে ঈমান ও নিফাক থাকতে পারে।

তাকফীরের প্রতিবন্ধকতাগুলো হচ্ছে, জাহালাতের ওজর, ইকরাহ তথা বাধ্য হওয়া, ভুল তাওয়িল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনো কিছু করা।

জাহালতের বিষয়টি তো স্পষ্ট। যেমন কোনো সাধারণ মানুষ কুফরীর কোনো কাজ করেছে। এমন মানুষের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর মৌলিক নীতি হচ্ছে, তাকে ওজর বিল জাহল ধরা হবে। এ ওজর বিল জাহল তখন সরে যাবে, যখন তার উপর স্পষ্ট প্রমান সাব্যস্ত হবে। তাই যখন তার ইলম থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হবে, তখন তার ওজর বিল জাহাল বাদ পড়ে যাবে।

যেমন অনেকেই এমন আছে যারা জর্দানের পার্লামেন্ট ও মন্ত্রণালয়ে যায়। তারা তাগুতের দলে প্রবেশ করে। বিশেষ করে যাদের কাছে আদাতের দায়িত্ব থাকে, যারা আলস্নাহর বিধান ছেড়ে মানবরচিত বিধানে বিচার করে। এমন মানুষজন রিদ্দাহ ও কুফরী আমলে প্রবৃত্ত থাকে। তাছাড়া অন্য জটিলতায় জড়িত

থাকে যেমন, এমন মানুষজন বাদশাহর প্রতি ঈমান আনে, তাকে আনুগত্যের সাড়্গ্য দেয়। অর্থাৎ এমন মানুষের মাঝে অনেক কুফরী কর্ম থাকে। কিন্তু আমরা কেবল তার পার্লামেন্টে প্রবেশের কারণে, তাকে সরাসরি কাফের বলে দিতে পারি না। আমরা এড়্গেত্রে বলবো যে, লোকটা কুফরের দলের একজন। কারণ কার্যত সে জর্দান সরকারের দলের একজন। আমরা এমন মানুষের ড়্গেত্রে বলবো যে, লোকটা কুফরী কাজ করেছে। কিন্তু তাকে নির্দিষ্ট করে কাফের বলার আগে, তার কাছে একদল আহলে ইলমকে যেতে হবে, তাকে বিস্ত্মারিত জানাতে হবে। তখন তার ওজর বিল জাহল দূর হবে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অধিকাংশরই শরয়ী ইলম নেই। যখন তাদের কারো উপর হুজ্জত কায়েম করা হয়। তখন যদি সে তার অবস্থানে অটল থাকে, এবং বলে: আমরা তোমাদের চাইতে রাজনীতি বিষয়ে বেশি বুঝি। তোমাদের কাছে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা নেই। আমরা অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ। ইত্যাদি ইত্যাদি। নিজের অবস্থানে অটল থেকে এমন লোক শরয়ী হুকুমকে হেয়জ্ঞান করলো। তার থেকে ওজর বিল জাহলও বাদ পড়ে গেল।

ইকরাহ বিষয়ে আসি। ইকরাহ কারো ক্ষেত্রে ওজর হতে পারে। এজন্য যারা পার্লামেন্টে যায় বা মন্ত্রী হয়েছে এমন লোকদের আমরা জিজ্ঞেস করবো, 'তারা কী তোমার মাথায় অস্ত্র রেখে তোমাকে জোর করেছে এবং বলেছে যে, "তোমাকে মন্ত্রী হতেই হবে?"'...যদি তার উপর জোর-জবরদস্তি করা হয। তাকে বাধ্য করা হয়। তবে কিছু সময় পর তো সে এটা থেকে প্রস্থান করতে পারে। যদি আসলেই এরকম হয়, তবে আমরা এমন ব্যক্তিকে তাকফীর করতে পারি না। কিন্তু বাস্তবে এমনটা ঘটে না। বরং বাস্তবে তো একজন লোক নিজ থেকে প্রতিযোগিতা করে, দৌড়ঝাঁপ করে তবে মন্ত্রী বনে। তারা পরস্প রে ঝগড়া-তর্ক করে এরপর নিজেরা মন্ত্রী হয়। এমনকি এক ভাই, নাম তার আবু উসামা আব্দুল আজীজ মিসরী, এখানকার কেউ কেউ তাকে চেনেন, তিনি এ শিবিরে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেন, 'জর্দানে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কিছু লোক প্রধান তত্ত্বধায়কের উপর রেগে যায় আর তাকে বলে, "হে ভাই, কেন আমাকে মন্ত্রীত্ব দেওয়া হয়নি?" তখন তত্ত্বধায় বলল, "বাদশাহ আমাদের ৫টাই দিয়েছেন মাত্র।" তারা তখন বলল, "ভাল। কেন আপনি আমাকে মনোনীত করলেন না। কেন আমাকে বাদ দিয়ে অমুককে নিলেন?"

তারা একে অপরের সাথে এ নিয়ে লড়াই করে। তাই ইকরাহ ওজরটি তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। অবশ্য এখানে এ উদাহরণটি তুলে ধরেছি যেন বিষয়টা স্প ষ্ট হয়।

তৃতীয় প্রতিবন্ধকটি হচ্ছে, ভুল তাবীল করা। অর্থাৎ এমন লোক, যে শরয়ী কল্যাণার্থেই তাবীল করে থাকে। কিন্তু ভুল তাবীল করে কুফরের আমলে প্রবৃত্ত হয়। তার তাবীল শরয়ী কল্যাণার্থে হয়ে থাকে। অনেক মানুষই এটাতে প্রবৃত্ত আছে। যেমন, আব্বাস মাদানী। যখন আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, *কেন আপনি কুফরী গণতন্ত্রে প্রবেশ করলেন?* তখন তিনি এমন জবাব দেবেন যে, *আসলে তিনি গণতন্ত্রের প্রতি সন্তুষ্ট নন। তার গণতান্ত্রিক পদ্ধতী গ্রহণ করা এমন ঢেউয়ের উপর চড়ে বসার মতো, যে ঢেউয়ের মাধ্যমে তিনি সরকারকে সমস্যায় ফেলবেন এবং সরকারকে এক কোণায় নিক্ষেপ করবেন।*

অবশ্য তার ক্ষেত্রে বিপদটা হালকা অন্যদের তুলনায়। কারণ গানুশীর মতো, তুরবীর মতো লোকেরা তো গণতন্ত্রের প্রতি তুষ্টতা ও আকীদাগত দিক থেকে পরিতুষ্ট। তারা আব্বাস মাদানী বা অন্য মানুষদের মতো নয়। ভুল তাবীলের ওজর তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যেহেতু সে হারাম পদ্ধতি গ্রহণ করে তার

মাধ্যমে কল্যাণের আশা করে গুনাহগার হয়েছে। কিন্তু তার অন্তর গণতন্ত্রের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। যদি তার কাছে শাসনক্ষমতা আসেও, তবে সে ওয়ান পার্টির পন্থায় শাসন করবে।

একবার আমি রাশেদ গানুশীর সাথে বসেছিলাম, তার সাথে আলোচনা করেছিলাম। তখন কথার মাঝখানে গানুশী খুব মারাত্মক একটি কথা বলে গণতন্ত্র সম্পর্কে। প্রথমে সে বলে, *'গণতন্ত্র পশ্চিমারা শূরা থেকে গ্রহণ করেছে। এটা আসলে ইসলামী। এটা আমাদের হারানো সম্পদ আমাদের কাছে ফিরে এসেছে।'* সে আরো বলেছিল, *'কুফর ও ঈমানের বিষয়টিতে জনগণ সিদ্ধান্ত দেবে। কারণ জনগণই কুফর ও ঈমানের বিষয়াদিতে সিদ্ধান্ত দিতে পারে। যখন জনগণ নিজেদের জন্য কুফরকে বেছে নেয়, তখন আমরা তাদের উপর ঈমান চাপিয়ে দিতে পারি না। কারণ* لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ *(দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই।)*[20] এমন না যে, এগুলো কেউ আমার কাছে বলেছে, কেউ একজন মাধ্যম ছিল আমাদের দুজনের মধ্যে। বরং আমি নিজ কানে তাকে এ কথাগুলো বলতে

---

[20] m~iv evKviv : 256|

শুনেছি। আমরা তখন উভয়ে রাতের খাবারের সময় কথা বলছিলাম। এ লোকটা এমন কথা সন্তুষ্টচিত্তে বলেছে।

গানুশী বলে, *‘আমরা যখন শাসন করবো, যখন ক্ষমতা আমাদের হাতে ফিরে আসবে, তখন আমরা ইসলামের মাধ্যমে শাসন করবো এবং কুফরের প্রতি উদারতা দেখাবো, যে কুফরের পক্ষ চাইলে রাষ্ট্রে তাদের কথা রাখতে পারে। কম্যুনিস্টরা চাইলে দল গঠন করতে পারে। পুঁজিবাদীরা চাইলে দল গঠন করতে পারে। কারণ নিজদের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইসলামকে তারা ভয় করবে না। যদি মানুষের সামনে কুফর ও ইসলাম উপস্থাপন করা হয়; তবে মানুষ ইসলামকেই বেছে নেবে। আমরা প্রত্যেক কাফের, দাঙ্গাবাজ, দুশ্চরিত্রকে তাদের কথা রাখার সুযোগ দেবো, তারা চাইলে দল গঠন করতে পারে, তারা চাইলে সাংবাদিকও রাখতে পারে। অচিরেই মানুষজন ইসলামকে বেছে নেবে। কিন্তু যদি জাতি বেছে নেয় -অবশ্যই নির্বাচনের মাধ্যমে- কুফরকে। তবে আমরা কুফরী হুকুমত মেনে নেবো। যদি জাতির অধিকাংশ এটা বেছে নেয়, তবে* لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ *(দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি বা বাধ্য-বাধকতা নেই।) তখন ক্ষমতায় থাকা কুফরী মতবাদ আমাদেরকে সুযোগ দেবে আমাদের কথা ব্যক্ত করার। আমাদেরও সাংবাদিক থাকবে। আমরা ইসলামের দিকে*

*আহ্বান করবো মানুষদের। যেহেতু আমাদের অনুমোদন থাকবে। তাই আমরা কুফরের হুকুমত মেনে নেবো। সময়ের সাথে, সত্যকে মানুষের সামনে উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে একসময় আমরা অধিকাংশের পছন্দ পাবো, এরপর আমরা হুকুমতে অধিষ্ঠিত হবো। যখন আমরা হুকুমতে অধিষ্ঠিত হবো, তখন কুফরকে তার মতবাদের দিকে আহ্বান করার সুযোগ থাকবে। এভাবে আমরা ও কুফর উভয়ে পালাক্রমে ক্ষমতায় আসবে মানুষের আগ্রহ অনুযায়ী।*গানুশী এভাবে বলেছিল।

এক নৈশ ভোজনে এ কথপোকথন হয়। তখন সেখানে আমি ছিলাম। সাথে আরো ১০/১৫ জন ছিল। আমি তাকে এক কথায় বললাম, 'জনাব, আমি আমার মতটা বলবো, হয়তো বা আপনার পছন্দও না হতে পারে?' গানুশী বললেন, 'বলতে পারেন। আমি গণতন্ত্রী। কাফেরদের কথা শুনে কষ্ট পেলে তা সহ্য করি। আপনি আমার ভাইদের একজন, এটা তো আরো উপযুক্ত যে, ভাইরা যখন চায় তাদের কথা বলতে পারে।' আমি তখন বললাম, 'একটু আগে যে কথাটা আপনি আমাদের বললেন সেটা তো আমাদের ধর্ম থেকে হয়ে যাওয়া এবং কুফরী করার মতো কথা।' গানুশী বললেন, 'আলস্নাহর কাছে আশ্রয় চাই, কেন?' আমি বললাম, 'আপনি এমন এমন বলেছেন।'

তিনি এবার বললেন, 'আমি এমন বলিনি...' আমি তাকে বললাম, 'আমরা কথা রেকর্ড করেছি| যদি আপনি চান, তবে এখনই তা বাজিয়ে দেখাতে পারি| অথবা আপনি যেটা বলেছেন, সেটার অন্য ব্যাখ্যা থাকলে বলেন|' তখন গানুশী এ কথাকে অন্য পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করলেন| একই কথা আবার পুনারাবৃত্তি করলেন|

যখন তাকে কিতাল বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়| তার একটা সাড়্গাৎকার আসে 'ফিল আলাম' ম্যাগাজিনে| এটা ইউরোপে প্রকাশিত হয়| কখনও কখনও এখানেও আসে| যখন তাকে কিতাল ও কঠোরতা বিষয়ে প্রশ্ন করা হল| তিনি জবাব দিলেন, *'কিতাল ইসলামের একটা শাখাগত বিষয়| ইসলাম কিছু সমস্যা সমাধানের জন্য এটাকে এনেছে| কিন্তু কিতাল ইসলামে ঘৃণিত বিষয়| আর তার দলীল হলো, আলস্নাহ তাআলা বলেন,* كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ *(তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়|)*[21] এভাবে ছিল কথাটা|

আমি বললাম, 'সুবহানালস্নাহ, এ তো বাতিল ইসতেম্বাত| এমনকি শাব্দিক দিক থেকেও এ ইসেতম্বাত বাতিল| কুরআন

---

[21] m~iv evKviv : 216|

বলছে, وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ (অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়)| আর গানুশী বলছে, কিতাল ইসলামে ঘৃণিত| কিতাল মুসলিমদের জন্য নয়| আমরা তাকে বলি আয়াত পূর্ণ করম্নন| আপনি তাদের মতো হয়ে যাবেন না, যারা لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ (তোমরা নামাযের ধারে-কাছেও যেও না)[২২] পর্যন্ত্ম আয়াত বলে, এর পরেরটা বলে না| আপনি আয়াতের পরের অংশটা দেখুন, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছো, যা তোমাদের পক্ষে বাস্ত্মবিকই মঙ্গলজনক|)[২৩]'

এ সকল মানুষের চিন্ত্মাধারা এমন, তাদের আকীদা-বিশ্বাস এমন| তুরাবীও একই রকমের| অনেক মানুষই আকীদা-বিশ্বাসে এমন| এ মহামারীতে তাদের পুরো ইসলামী কর্মকা- আক্রান্ত্ম|

যখন এমন মানুষগুলোর মাঝে এমন কিছু কুফরী পাওয়া যায়, যে কুফরীগুলো তাদের কাফের বানিয়ে দেয় অথবা যখন কোনো আলেম এমন লোকের ব্যাপারে মিলস্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার হুকুম লাগায়, তাকে নির্দিষ্ট করে কাফের বলে; এ

---

[22] m~iv wbmv : 43|

[23] m~iv evKviv : 216|

হুকুম লাগানো, এ ফতোয়া দেওয়া একটা প্রক্রিয়া শেষে করা হয়। কাউকে তখনই তাকফীর করা হবে, যখন আমরা ধৈর্য ধরে তার ক্ষেত্রে কী কী ওজর আছে তা বাছাই করে দেখবো, সেগুলো একটা একটা করে পরীক্ষা করে দেখবো, যখন আমরা নিশ্চিত হবো যে, কোনো ওজর নেই। তখন তাকফীর করা যায়।

আমরা দেখবো, সে কী জাহেল? যদি তার ইলম থাকা প্রমাণিত হয়, তবে তার জাহালাতের ওজর বাদ পড়বে।

আমরা দেখবো, সে মুকরাহ কিনা। তার মুকরাহ (জোর-জবরদস্তিতে বাধ্য) হওয়ার ওজরটা চলে যাবে, যখন ইকরাহের অবস্থা থেকে বের হওয়ার সুযোগ থাকে। যেমন, সে যেখানে ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে যাবে, পালাবে। অথবা যে শহরে বসবাস করতো, সেখানে থাকবে না। অন্য জায়গায় চলে যাবে।

তৃতীয় ওজর হচ্ছে, সে কী ভুল তাবীলের বশবর্তী কিনা। তার মাঝে কোনো ভুল থাকতে পারে, যেটা অন্য কেউ বুঝিয়ে বলতে হবে। যেমন, জর্দানে তারা বলেছিল, 'আমরা ক্ষমতায় ইসলামকে সহিংসতার পদ্ধতিতে নিয়ে যাবো না। বরং আমরা আশা করি আমরা সে মিম্বার (পার্লামেন্ট) অর্জন করে নেবো।

আর আমরা পার্লামেন্টের মাধ্যমে সত্যের কথা উচ্চ আওয়াজে ঘোষণা করবো।’ এ লোকগুলো পার্লামেন্টে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা গ্রহণ করেছে কল্যাণের আশায়। শরয়ী কল্যাণ বাস্তবায়ন করতে চাইছিল শরীয়তসম্মত নয় এমন পন্থায়। ভুল তাবীল জাহালাতের মতোই। এটা হুজ্জত কায়েম করলেই রহিত হয়ে যায়। অর্থাৎ যে জন ভুল তাবীলের বশবর্তী, আপনি তার কাছে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলবেন যে, তার এ তাবীল ভুল। এভাবে ভুল তাবীলের ওজরটি বাতিল হয়ে যাবে। বলবেন, আহলুস সুন্নাহর অবস্থান এমন, কুরআন-সুন্নাহর অবস্থান এমন। যখন সত্য স্প ষ্ট হযে যাবে, তখন সে মানুষটার ওজর শেষ হয়ে যাবে।

এরপর বাকী থাকে শেষ ওজরটি। সেটা হচ্ছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোনো কাজ করা। অর্থাৎ কেউ কোনো কাজ করে ফেলল, কিন্তু আদতে সে কাজটা করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না তার। যেমন, এক লোক নামাজে দাঁড়ালো কিবলার দিকে ফিরে। কিন্তু হঠাৎই দেখল, তার সামনে একটি মূর্তি। প্রথমে সে এ মূর্তি দেখেনি। মূর্তিকে সামনে রেখে নামাজ পড়ার ইচ্ছে তো তার ছিল না। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটা ঘটে গেছে। এদিকে অন্য কেউ এসে তাকে এ অবস্থায় দেখে বলল, *‘দেখো এ কাফের মূর্তিকে সামনে রেখে নামাজ পড়ছে।’* এখানে তাকফীর করার আগে করণীয়

হচ্ছে, অপেক্ষা করা। যখন লোকটা নামাজ শেষ করে, তখন তাকে বলা যাবে, *'ভাই, কেন তুমি মূর্তি সামনে নিয়ে নামাজ পড়ছো?* যখন এ কথাটা বলা হবে, তখন দেখা যাবে লোকটা বলছে, *'ভাই, আমি জানতাম না এখানে একটা মূর্তি আছে। আমি তো কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।'* এমন ব্যক্তি মিলস্লাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে না।

কোনো কোনো আলেম বলেন, 'انتفاء القصد (অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করা)-এর অর্থ হচ্ছে, انتفاء نية الكفر وعين الكفر بالله তথা কুফরের নিয়ত না থাকা এবং আলস্লাহর সাথে কুফরী করার নিয়ত না করা। যেমন, কেউ ইচ্ছা করে একটা কুফরী কাজ করলো, কিন্তু আসলে সে কাজটার মাধ্যমে কুফরী করার নিয়ত করেনি।' কিন্তু আহলুস সুন্নাহর মূলনীতি হচ্ছে, انتفاء القصد (অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছু করা)-এর অর্থ হচ্ছে, অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও কোনো কুফরী কাজ হয়ে যাওয়া। যে কুফরী কাজটা কৃত হয়েছে, সেটা আদতেই করার ইচ্ছা কর্তার মধ্যে না থাকা। এ বিষয়ে আহলে ইলমের অনেক কথাবার্তা রয়েছে।

মোটকথা, যখন কোনো ব্যক্তি রিদ্দার কাজ করে, তার মাঝে কোনো ওজরও না থাকে, তবে সে মুরতাদ। এ নিয়মের উর্ধ্বে

নয় কেউই| চাই সে যত বড় মাপের মানুষই হোক না কেন| এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মূলনীতি|

আরেকটি বিষয় হচ্ছে, ঈমানের দল ও কুফরের দল| কখনও কখনও আপনি মানুষকে পাবেন যে তাকফীরের উপযুক্ত কাজ করে| যেমন, একজন লোক পার্লামেন্টে যায়, পার্লামেন্টের সদস্য হয়| আপনি তাকে বললেন, ‘আপনার এ কথা ইসলাম থেকে বের করে দেয়|’ কিন্তু লোকটা তার নিজের ব্যাখ্যার উপরই থাকালো| কিন্তু আপনি বলতে থাকলেন, ‘এ কাজটা রিদ্দাহর কাজ, অথবা কুফরী কাজ| কিন্তু এ লোকটা, অমুকের ছেলে অমুক, কাফের নয়|’

আমরা এখন দুপড়োর আলেমের দিকে দৃষ্টিপাত করবো| একপড়ো আছেন শা’রাবী ও বুতীর মতো আলেম| অন্যপড়ো আছেন ইবনে বাজের মতো আলেম| দুপড়াই এমন কাজ করেছেন, যেটা রিদ্দা-কুফরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ| দুপড়াই সরকারের পড়ো ফতোয়া দিয়েছেন| দুপড়াই সরকারের কাছ থেকে গ্রহণ করেন| দুপড়াই মুসলিম ভূমিতে কাফেরদের দখলদারিত্বকে বৈধতা দিয়েছেন| এবং বিপদে পড়ে গেছেন|

কিন্তু আপনি ইবনে বাজের পড়োর দিকে তাকালেন। তাকালেন তার অতীত ইতিহাসে। ইলম অন্বেষণ, ইলম শেখানো, সুন্নাতের ইহতেমাম, সুন্নাতের প্রতি উৎসাহ। তার অতীত জীবন সুন্দর। এ বিষয়টি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে আমরা তার এমন পদস্খলন দেখি না। তাহলে আপনি তার ড়োত্রে বলতে পারেন, তিনি ভুল ব্যাখ্যার উপরে আছেন। অকল্যাণ ঠেকাবার জন্য এমন তাবীল করেছেন তিনি। আমাকে ইবনে বাজের অনেক ঘনিষ্ঠজন বলেছেন যে, ইবনে বাজের কাছে তারা শুনেছেন যে, ফাহাদ কাফের। কিন্তু এ কথাটা ঘোষণা করার মাঝে মানুষের অকল্যাণ রয়েছে। অবশ্যই এ তাবীল ফাসেদ ও প্রত্যাখ্যাত। এ তাবীল আহলুস সুন্নাহর উসূল মোতাবেক মারদূদ আলাইহী। কিন্তু তিনি এমন তাবীল করেছেন। তাই আমি এক বড় আহলে ইলমকে জিজ্ঞেস করি যে, *'ইবনে বাজের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? মানুষ যে তার উপর মুরতাদ হুকুম লাগানো শুরম্ন করেছে?'* তিনি জবাব দিলেন, *'আমি তার উপর কতয়ীভাবে রিদ্দাহর হুকুম লাগাই না। আমি বলি, ইবনে বাজের অনেক বড় একটা পদস্খলন হয়েছে। কিন্তু তিনি এমন কোনো কাজ করেননি যে, যা তাকে মুরতাদ বানিয়ে দেয়।'* আমি বললাম, *'যে সব মানুষ ইবনে বাজের এসব কাজের কারণে তার উপর রিদ্দাহর হুকুম লাগায়,*

আপনি তাদের সম্পর্কে সম্পর্কে কী বলেন?' তিনি বললেন, *'তাদের দলীল শক্তিশালী। কিন্তু বিষয়টা সে পর্যন্ত পৌঁছে না, যেটা তারা বলে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লাহ তাকে ও তার মতোদের ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু লোকটা নিজকে এ বিষয়ে একেবারে সংকীর্ণতা, একেবারে কোণায় নিয়ে ঠেকিয়েছে।'*

তাকফীরের বিষয়টাতে সাবধান থাকতে হবে। এক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করা আবশ্যক। আর যে কাজ আদতে কুফরী, সেটা তো স্পষ্ট যে, কাজটা কুফরী। যে লোক এমন কোনো কাজ করবে, সে একটা কুফরী কাজ করল। স্পষ্ট করে বললে, যদি আমরা যদি উলামায়ে সাউদিয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি, তারা কী কুফরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের পক্ষে জিহাদের দলে নাকি তারা সরকারের দলে? জবাব হচ্ছে, প্রত্যেক মস্তিষ্কসম্পন্ন অবস্থা যেমন দেখছেন যে, তারা সরকারের দলে। এটা তো পুরনো কথা। যদি আপনি মানুষকে দুভাগে ভাগ করতে যান। তবে একদল মানুষ সরকারের সাথে পাবেন। আরেকদল পাবেন সরকারে বিপক্ষে। তখন প্রশ্ন করুন, উলামায়ে সাউদিয়া কোন দলে পড়ে? তারা সরকারে পক্ষে, সরকারের দলের অন্তর্ভুক্ত। দলগতভাবে তারা সরকারের পক্ষে। কিন্তু আপনি

কী ত্বরাপ্রবণ হয়ে যারাই সরকারের দলের অন্তর্ভুক্ত আলেম আছেন, তাদের সবাইকে একজন একজন করে অমুকের বেটা অমুক কাফের বলে দেবেন? অবশ্যই না। আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এ বিষয়ে।

আশা করি বিষয়টা স্পষ্ট হয়েছে। তাই আমরা তাকফীরের পেছনে পড়বো না। রব্বুল আলামীন আমাদেরকে এ আদেশ করেননি যে, আমরা তাকফীরের বিষয়েই কথা বলতে থাকবো। প্রত্যেককে নাম-পরিচয় সহ জানতে হবে যে, মানুষের মধ্যে কে কুফরী করেছে, কে কুফরী করেনি। বরং আমাদের করণীয় হচ্ছে, আমরা সে সব কাজের ব্যাপারে জানবো যেগুলো মানুষকে কাফের বানিয়ে দেয়। আমরা জানবো যে, কোন কাজটা কুফরী, কোন কাজটা কুফরী নয়। আশা করি বিষয়টা এখন স্পষ্ট।

২. দরবারী আলেমদের তাকফীর করা প্রসঙ্গে একটি প্রশ্নের উত্তর

[উপস্থিত একজন শাইখকে একটা প্রশ্ন করেন৷ প্রশ্নটা বিষয় সংশিস্নষ্ট ছিল না আর প্রশ্নটার উত্তর কাঙ্ক্ষিত বিষয় বোঝার ড়্গেত্রে ব্যাঘাত হতে পারে বিধায় আমরা এখানে উলেস্নখ করছি৷]

- উপস্থিত একজন শাইখের কথা কেটে দরবারী আলেম ও তাদের তাকফীর করা বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে শাইখ তার প্রশ্নের উত্তরে বলেন:

গতকাল আমরা এ বিষয়টি বিস্ত্মারিত উলেস্নখ করেছি৷ কোনো আলেম তখনই দরবারী আলেম অথবা সরকারের পড়্গের বলে গণ্য হবে, যখন তার মাঝে তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে৷ আমরা বলেছিলাম যে, এমন আলেম আইনীরূপে মুরতাদ হলেও অথবা না হলেও রিদ্দাহর/কুফরী কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে৷...শর্তগুলো হচ্ছে:

প্রথম বৈশিষ্ট্য: যে আলেম বেতন নেয়৷ সরকারের কাছ থেকে পয়সা নেয়৷ স্বতন্ত্র কোনো আলেম নয়৷ বরং সে কর্মচারী হিসেবে

চাকুরী করে। যদিও এমনও স্বতন্ত্র আলেম আছে, তারা এবং তাদের বিবৃত ফতোয়া সরকারী আলেমদের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়। কিন্তু সরকারী আলেম অনিষ্টতা ও নিকৃষ্টতার প্রধান সম্ভাব্য স্থল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: যে আলেম কাফেরদের মুসলিম বলে সাড়্গ্য দেয়। এমন আলেম সরকারকে, সরকারের দলকে, সরকারের নিরাপত্তা বাহিনী সম্পর্কে সাড়্গ্য দেয় যে, তারা ইসলামের উপরে রয়েছে। এমন আলেম আরো সাড়্গ্য দেয় যে, যারা রাষ্ট্রপড়্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তারা বিদ্রোহী, খারেজী, বিভ্রান্ত্ম।

যেমনটা আজহারের বিবৃতিতে স্পষ্ট হয়েছে। দরবারী আলেমদের একটা স্পষ্ট রূপ হচ্ছে তারা। জামিআতুল আজহারের বিবৃতিতে এসেছে, 'মিসরে জিহাদের আমল শরীয়তসম্মত নয়। বিশেষ করে, মিসরের সরকার আলস্নাহর বিরম্নদ্ধে গিয়ে এমন কোনো আইন করেছে বলে আমরা জানি না। বিধানগতভাবে তারা আলস্নাহর বিরম্নদ্ধে গেছেএমন কিছু আমরা পাইনি।' আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এ বিবৃতিতে বলেছে, যে ব্যক্তি জিহাদের কথা বলে সরকার-রাষ্ট্রপড়্গের বিরম্নদ্ধে যাবে, সে সন্ত্রাসী, বিদ্রোহী, খারেজী, অপরাধী। আজহার কর্তৃপড়্গ এ

বিবৃতিতে মিসরের শাসক ও বিচারক সম্পর্কে বলেছে যে, তারা শরীয়তের বাইরে বেরিয়ে যায়নি। বিবৃতিতে বলা ছিল, সরকার আলস্নাহর কোনো বিধানের বিরম্নদ্ধে গেছেএমন কোনো প্রমাণ তারা পায়নি।

এসকল আলেম তিনটি শর্তই, তিনটি বৈশিষ্ট্যই পূরণ করেছে এবং রিদ্দাহর কাজ ও কুফরী কাজে প্রবৃত্ত হয়েছে। তাদের ব্যাপারে এমনটাই বলা হবে। আর তাদের নির্দিষ্ট কারো কাফের হওয়া, অর্থাৎ সরকারী আলেমদের কারো মিলস্নাতে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে কি বের হয়ে যায়নি, সেটা জানার জন্য প্রত্যেকের ড়্গেত্রে তাকফীরের শর্ত ও মানে' বিষয়ে গবেষণা ও পরীড়্গণের প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় আমরা তাড়াহুড়ো করবো না। সাধারণত কাউকে কুফরী কাজ করতে দেখলেই সাথে সাথে তাকে তাকফীর করে ফেলবো না। আর যদি কাউকে কোনো শ্রেণীতে ফেলতে হয়; তবে আমরা বলবো, এ লোকটা কুফরের দলের, এ লোকটা সরকারী আলেমদের একজন। আমরা যখন উম্মাহকে আহলে হক ও আহলে বাতিল দুভাগে শ্রেণীবিভাগ করতে যাবো, তখন দরবারী আলেমটা আহলে বাতিলের দলে পড়বে। যদিও সে আইনী কাফের নয়। বরং কারো ড়্গেত্রে দেখা যাবে লোকটা জাহেল, আবার কারো ড়্গেত্রে দেখা

যাবে, লোকটা জোর-জবরদস্তিতে বাধ্য মুকরাহ, ইকরাহের ওজর প্রাপ্ত।[২৪]

----

[24] ÔZvKdx‡ii bxwZ I cÖwZeÜKZvÕ wel‡q kvBL Avey gymAve Avm-myixi M„nxZ gvRnve m¤ú‡K© we¯ÍvwiZ Rvb‡Z دعوة المقاومة العالمية wKZv‡ei نظرية التكفير Ges أعذار الجهل والإكراه والتأويل وانتفاء القصد As‡ki المنهج والعقيدة القتالية wk‡ivbvgaxb Av‡jvPbvUv †`Lyb|